বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

শ্রীঅতুল সুর

বি চি ত্র বি দ্যা গ্র ন্থ মা লা

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

অতুল সুর

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

VICHITRA-VIDYA-GRANTHAMALA : 3

BANGALIR NRITATVIK PARICHAYA

By Dr. Atul Sur

প্রথম প্রকাশ

৩১শে মার্চ, ১৯৭৭

প্রকাশক

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জি জ্ঞা সা

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলিকাতা ২৯

১-এ ও ৩৩ কলেজ রো

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর

শ্রীনিরঞ্জনকুমার দাস

শঙ্করনারায়ণ প্রেস

৬-এ, অখিল মিস্ত্রি লেন,

কলিকাতা ৯

১'১

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদের কাছে নৃতত্ত্ব বিষয়
অধ্যয়ন করেছিলাম সেই দুই মনীষী
অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার
ও
ড. বিরজাশঙ্কর গুহ মহোদয়গণের
স্মরণে

নিবেদন

'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। বোধ হয় নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় এইটাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। পরবর্তী কালের কর্মব্যস্ততা ও পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যে এই রচনাটির কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মাত্র দুই মাস পূর্বে আমার সহকর্মী শ্রীকানাইলাল বসু তাঁর কাছে সংরক্ষিত এই গ্রন্থের একখানা কপি আমাকে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় এর পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। কালের তিমির গহ্বর থেকে উৎখনিত এই রচনাটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে তিনি বিশেষভাবে আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বইখানির দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত জনসংখ্যা-সমূহ আদম-সুমারির শেষ অধিগত বিবরণী অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে এবং বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়টি নতুনভাবে লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া, বইখানি যেমন ছিল তেমনই আছে।

রাস পূর্ণিমা,
২০শে কার্তিক, ১৩৮০

অতুল সুর

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতির লোক নানা দিগ্‌দেশ হতে এসে ভারতের মহাক্ষেত্রে মিলিত ও মিশ্রিত হয়েছে। এই মিশ্রণ ও মিলনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব নিরূপণ করা বর্তমানে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তা হলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব নিরূপণের একটা চেষ্টা আমরা এখানে করব।

নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব নিরূপণের জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়—

১. প্রাচীনতম মানবের কঙ্কালাস্থি।
২. জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক নজির।
৩. বর্তমানে দৃষ্ট জাতিগুলির নৃতত্ত্বমূলক বৈজ্ঞানিক পরিচয়।

দুই

স্যর আর্থার কীথ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ Antiquity of Man নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বলেছিলেন—'India is a part of the world from which the student of early man has expected so much and so far has obtained so little.' ('প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরা ভারতের দিকেই আশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে।') স্যর আর্থারের এই উক্তি এখন আর সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, এ বিষয়ে অনুসন্ধান এখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এবং ভারতের কোথাও কোথাও প্রাচীন উপাদান ও মানবের কঙ্কালাদি পাওয়া গেছে। বাংলার নৃতাত্ত্বিক আলোচনার পূর্বে আমরা সে বিষয়ে পাঠকবর্গের কাছে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ভারতে যাঁরা প্রাচীন কঙ্কালাস্থির অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বহির্ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার ইয়েলের ন্যাচারাল মিউজিয়ামের অধ্যাপক ডক্টর টেরের এ বিষয়ে অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁর প্রথম অভিযানে প্রাচীন যুগের প্রকৃত মানবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া যায় নি, তথাপি মানবের বিবর্তনের কতকগুলি মূল্যবান সূত্র তিনি এখানে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এক কথায় বলতে গেলে মানবাস্থির সন্ধান না পেলেও, মানবের পূর্ববর্তী পুরুষদের অস্থির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পর্বতমালায় তিনি রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস, ব্রহ্মপিথেকাস প্রভৃতি নামধেয় নরাকার জীবগণের জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কারগুলি নৃতত্ত্বের উপর নূতন আলোকপাত করে; কারণ তৎপূর্বে এই পর্যায়ের জীবগণের তথ্য অজ্ঞাত ছিল। ইয়েল অভিযানের সদস্য লুইস সাহেবের মতে এই জাতীয় জীবগুলি (higher primates) জগতের এই অঞ্চলেই প্রথম প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এদের চিবুকাস্থি ও দান্তিক সংস্থান অনেকটা মানবেরই কাছাকাছি। এ থেকে মনে হয় যে, মানবের বিবর্তন এই অঞ্চলেই ঘটেছিল।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডক্টর টেরা ভারতে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় অভিযানেও তিনি আদিম যুগের মানবের জীবাশ্ম পান নি। তথাপি এই প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযানের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এই অভিযানদ্বয়ে এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসরের পুরাতন ভূ-স্তর হতে তৎকালীন ভারতে মানব-বাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। এ থেকে মনে হয় যে ভারতে আদিম মানবের জীবাশ্মের সন্ধান নিতান্ত বৃথা স্বপ্নবিলাসমাত্র নয়। জগতের অপরাপর অংশে ক্রমশ সে সন্ধান যেমন মিলছে, একদিন ভারতেও সেরূপ সন্ধান সফল হবে। দ্বিতীয় ইয়েল-কেম্ব্রিজ অভিযানের অন্যতম সদস্য ড্রামণ্ড সাহেব বলেন, প্রাগৈতিহাসিক মানব মধ্য-এশিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে। এরূপ ধারণা করা হলেও, প্রাগৈতিহাসিক মানবের বিষয় আলোচনা করতে হলে, ভারতেও গবেষণা চালান আবশ্যক। সুদূর প্রাচীনতম যুগ হতে আদিম মানবের সন্ধান ভারতে পাওয়া আদৌ বিচিত্র নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনুরূপ নরাকার জীবের কঙ্কাল, আমরা এশিয়ায়

তিন জায়গা থেকে পেয়েছি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রস্থ গিরিমালা ছাড়া, জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ-এ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখা দ্বারা সংবদ্ধ করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাঙলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। সুতরাং এরূপ জীবসমূহ যে বাঙলা দেশের উপর দিয়েও যাতায়াত করত, সেরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

জগতের অন্যত্র আদিম মানবের জীবাশ্মের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিদর্শন (cultural relics) আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতে আদিম মানবের জীবাশ্ম পাওয়া না গেলেও তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিদর্শন বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে, এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আদিম মানব যে ভারতে বহু বিস্তৃতভাবে বাস করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নানা স্তরের আয়ুধ ও ব্যবহার্য বস্তুর নিদর্শন যেমন পশ্চিম ইওরোপ খণ্ডে পাওয়া যায়, তেমনই বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, গোদাবরী, নর্মদা ও কৃষ্ণার অববাহিকায়, মধ্য ভারতে, বর্তমান কর্ণাটক, ছোটনাগপুরে, বিহারের কোন কোন স্থানে, আসাম, পাঞ্জাবে ও সীমান্ত প্রদেশে পাওয়া গেছে। নবপলীয় যুগেরও নিদর্শন ভারতের নানা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। মাত্র নবপলীয় যুগের ও তৎপরবর্তী যুগের (chalcolithic and megalithic ages) মানব জীবাশ্মই ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল জীবাশ্মের পরিচয় দেবার পূর্বে, আমাদের এখানে বিজ্ঞানসম্মত নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য যে সকল পরিমাপ বা মাপজোকের প্রয়োজন হয়, তার একটা পরিচয় দেওয়া দরকার।

দুই

এটা প্রায়ই সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দুজন মানুষকে কখনও একরকম দেখতে পাওয়া যায় না। দুজনের মধ্যে এমন একটা চেহারা ও অবয়বগত পার্থক্য থাকে, যার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য সবসময়েই নজরে পড়ে। এই ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, কোন এক বিশেষ জনসমষ্টির মধ্যে এমন কতকগুলো চেহারা [illegible] পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

এবং কোন বিশেষ জনশ্রেণীর মধ্যে অবয়বগত সাদৃশ্য নিরূপণ করে তাদের নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করাই নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের কাজ।

কিন্তু এখানে 'নৃতাত্ত্বিক-পর্যায়' (race) এই শব্দটির সংজ্ঞা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা আবশ্যক। সাধারণতঃ সম-সাদৃশ্যবিশিষ্ট কোন বিশেষ শ্রেণীকে আমরা 'জাতি' আখ্যা দিয়ে থাকি। যেমন আমরা বলে থাকি—আর্য জাতি, হিন্দু জাতি, ব্রাহ্মণ জাতি, বাঙালী জাতি ইত্যাদি। আর্য জাতি বলতে আমরা সেই জনসমষ্টিকে বুঝি যাঁরা আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কার অনুসরণ করেন। সেইরূপ হিন্দু জাতি বলতে আমরা সেই জনসমষ্টিকে বুঝি যাঁরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার পালন করেন। ব্রাহ্মণ জাতি বলতে আমরা তাঁদের বুঝি যাঁরা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া-কলাপ করে থাকেন। এবং বাঙালী জাতি বলতে আমরা তাঁদের বুঝি, যাঁরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে একটা বিশিষ্ট জীবনযাত্রা-প্রণালী, ভাষা ও সংস্কৃতি অনুসরণ করেন। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে 'জাতি' শব্দের কোন একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কিন্তু 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়' বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝি, যাঁদের সকলের মধ্যেই কতকগুলি বিশিষ্ট অবয়বগত সাদৃশ্য আছে। অবয়বগত কোন্ কোন সাদৃশ্য থাকলে, আমরা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক-পর্যায়গত করব, সে সম্বন্ধে সুধীজনের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যেসকল লক্ষণ সুধীজন একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলি হচ্ছে—

১. মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং।
২. গায়ের রঙ।
৩. চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য।
৪. দেহের দৈর্ঘ্য।
৫. মাথার আকার।
৬. মুখের গঠন।
৭. নাকের আকার।

এই লক্ষণগুলির মধ্যে মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতম। চুলের বিশিষ্টতার দিক থেকে মানুষের চুলগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম, ঋজু বা সোজা চুল (straight hair)। এটা মঙ্গোলিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ।

দ্বিতীয়, কুঞ্চিত বা কোঁকড়া চুল (woolly hair)। এটা নিগ্রোজাতির লক্ষণ। তৃতীয়, তরঙ্গায়িত বা ঢেউখেলান চুল (smooth, wavy or curly hair)। এটা জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ। অনেক সময় অনেক পুরুষের (generations) রক্তের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহ্য বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু খণ্ডিত চুলকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক নৃতাত্ত্বিক-পর্যায়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। খণ্ডিত চুলকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কি ভাবে পরীক্ষা করা হয়, এবং তার কি কি লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে কোন বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করা হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা এ স্থলে সম্ভবপর নয়। তবে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা এ সম্বন্ধে সাঁ-মার্তার (St. Martin) বই পড়ে নিতে পারেন।

চুলের এবং চোখের রঙ অপেক্ষা নৃতত্ত্ববিদগণ গায়ের রঙের উপর বেশী জোর দিয়ে থাকেন। যদিও এটা দেখা গেছে যে কাল গায়ের রঙের সঙ্গে কাল চুলের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু কাল চুলের সঙ্গে কাল চোখের এরূপ কোন পারস্পরিক সাহচর্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ গায়ের রঙ অনুযায়ী মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—ফর্সা বা সাদা রং, ময়লা বা কাল রঙ, ও পীত রঙ। অবশ্য এই তিন শ্রেণীর আবার বহু উপবিভাগ আছে।

দেহের দীর্ঘতা অনুযায়ী মানুষকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন—

১. বামন (pygmy)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটারের কম।
২. খর্বাকৃতি বা বেঁটে (short)—উচ্চতা ১৪৮০ মিলিমিটার থেকে ১৫৮১ মিলিমিটার।
৩. মধ্যমাকৃতি বা মাঝারি (medium)—উচ্চতা ১৫৮২ মিলিমিটার থেকে ১৬৭৬ মিলিমিটার।
৪. দীর্ঘ (tall)—১৬৭৭ মিলিমিটার হতে ১৭২০ মিলিমিটার।
৫. অতিদীর্ঘ (very tall)—১৭২১ মিলিমিটারের উপর।

নৃতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য মানুষের মাথার আকার এক সূচক-সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সূচক-সংখ্যাকে cephalic index বা শির-সূচক সংখ্যা বলা হয়। মাথার দৈর্ঘ্যতার (সম্মুখভাগ হতে পশ্চাদ্‌ভাগ পর্যন্ত) তুলনায় মাথার

চওড়ার দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাতকেই cephalic index বলা হয়। এই অনুপাত অনুযায়ী মানুষের মাথাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—

১. লম্বা মাথা বা দীর্ঘশিরস্ক (dolicho-cephalic)—অনুপাত ৭৫ শতাংশের কম।

২. মাঝারি মাথা বা নাতিদীর্ঘশিরস্ক (mesaticephalic)—অনুপাত ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের কম।

৩. গোল মাথা বা বিস্তৃতশিরস্ক (brachy-cephalic)—অনুপাত ৮০ শতাংশ বা ততোধিক।

নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার আকারের পরিমাপ-প্রথার অনুরূপ। নাকের দীর্ঘতার (নাকের মাথা থেকে তলা পর্যন্ত) তুলনায় নাকের চওড়ার (তলদেশ) দিকের মাপের শততমাংশিক অনুপাতকে nasal index বা নাসিকা-সূচক সংখ্যা বলা হয়। এই অনুপাত অনুযায়ী মানুষের নাককে তিন শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যেমন—

১. লম্বা সরু নাক (leptorrhine)—অনুপাত ৫৫ শতাংশ হতে ৭৭ শতাংশ।

২. মাঝারি নাক (mesorrhine)—অনুপাত ৭৮ শতাংশ হতে ৮৫ শতাংশ।

৩. চওড়া নাক (platyrrhine)—অনুপাত ৮৬ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ।

তবে, একথা এখানে বলা আবশ্যক যে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়-ভুক্ত করবার জন্য অবয়বের কোন এক বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। উপরি-উক্ত সমস্ত অবয়ব-লক্ষণের সমষ্টিগত ফলের উপর নির্ভর করেই তাঁরা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করবার জন্য কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাঁরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক লোকের পরিমাপ গ্রহণ করেন।

চার

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রাচীন মানবের কঙ্কালাস্থি প্রাপ্তির বিবরণ দেওয়া স্থগিত রেখেছিলাম। ভারতের যে যে স্থান থেকে প্রাচীন মানবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া গেছে তার বিবরণ এখন দেওয়া হচ্ছে—

১. ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত ৪১টি কঙ্কাল।

২. পশ্চিম পাকিস্তানের হরপ্পায় প্রাপ্ত (১৯২৮-৩৯) ২৬০টি কঙ্কাল।

৩. ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের তক্ষশীলার ধর্মরাজিকা মঠে প্রাপ্ত ৬টি কঙ্কাল।

৪. ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের চান্থ-দারোয় প্রাপ্ত একটি কঙ্কাল।

৫. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর নিকট কুমহার-টেকরিতে প্রাপ্ত ৪২টি কঙ্কাল।

৬. ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তামিলনাড়ুর কোদাকানালে প্রাপ্ত পাঁচটি সমাধিপাত্র-পূর্ণ কঙ্কাল।

৭. ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরিতে প্রাপ্ত ১৪টি কঙ্কাল।

৮. ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের পিকলিহাল নামক স্থানে প্রাপ্ত তিনটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল ও একটি চিবুকাস্থি।

৯. ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের মাসকী নামক স্থানে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

১০. ১৯৫৭-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের নেভাসায় প্রাপ্ত ৩০টি কঙ্কাল।

১১. ১৯৫৬-৬০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনাকুণ্ডর উপত্যকায় প্রাপ্ত ১৩টি নবপলীয় যুগের কঙ্কাল ও ১৪টি মেগালিথিক যুগের সমাধি।

১২. ১৯৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের রূপার নামক স্থানের ২১টি সমাধিতে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

১৩. ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তামিলনাড়ুর অমিরথমঙ্গলম নামক স্থানে প্রাপ্ত ১০টি সমাধিপাত্র।

১৪. ১৯৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত ৮টি পুরুষ ও ৪টি নারীর কঙ্কাল।

১৫. ১৯৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের লোথালে প্রাপ্ত ২১টি কঙ্কাল।

১৬. ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনাকুণ্ডর ঠিক বিপরীত দিকে কৃষ্ণা নদীর উপর ইয়েশ্বরম নামক স্থানে প্রাপ্ত ৬টি কঙ্কাল।

১৭. ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের পুনা শহরের নিকট চণ্ডোলী গ্রাম হতে প্রাপ্ত ২৫টি কঙ্কাল।

১৮. ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানের কালিবঙ্গন হতে প্রাপ্ত কয়েকটি কঙ্কাল।

১৯ ১৯৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের টেককলকোটা স্থানে প্রাপ্ত ৯টি কঙ্কাল।

২০. ১৯৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বাঙলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ১৪টি সমাধি কঙ্কাল।

২১ ১৯৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের শ্রীনগরের নিকটে এক গ্রামে নবপলীয় যুগের সমাধিতে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

২২. ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

উপরি-উক্ত স্থানসমূহে প্রাপ্ত কঙ্কালাস্থিগুলি অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। সুতরাং সেগুলি নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের পক্ষে অনুপযুক্ত। আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নৃতাত্ত্বিক-পর্যায় নিরূপণের জন্য বহুসংখ্যক ও সম্পূর্ণ নরকঙ্কালের অভাবে আমরা ভারতের প্রাচীন কালের মানুষের পরিযান (এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে গমন), সংমিশ্রণ ও অভিযান সম্বন্ধে অভ্রান্তভাবে কিছুই বলতে পারি না। যেহেতু এই সকল নরকঙ্কালসমূহ নানা যুগের, সে জন্য সভ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এগুলিকে আমরা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি—ক. নবপলীয় যুগের, খ. হরপ্পা যুগের, গ. দাক্ষিণাত্যের তাম্রাশ্মযুগের, ঘ. মেগালিথিক যুগের, ও ঙ আদি-ঐতিহাসিক যুগের।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই কঙ্কালাস্থিসমূহ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এখানে তা সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে—১. হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও লোথালের লোকেরা অধিকাংশই দীর্ঘশিরস্ক ও বিস্তৃতনাসা ছিল, তবে মহেঞ্জোদারোর লোকেদের নাক হরপ্পা ও লোথালের লোকেদের মত অত বিস্তৃত ছিল না, ২. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর লোকেদের তুলনায় লোথালের

লোকেদের মাথা চওড়া ছিল, ৩. তবে এই সকল পার্থক্য থাকলেও মাথার খুলির আকার, নাকের গঠন ও আকারের দিক থেকে তারা একই নরপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ৪. তার মানে তারা দীর্ঘশিরস্ক, প্রশস্ত নাসা ও আকারে লম্বা ছিল। ৫. কিন্তু হরপ্পা-যুগে গুজরাটে ও সিন্ধু প্রদেশে বিস্তৃত-শিরস্ক জাতির বিদ্যমানতাও লক্ষিত হয়। ৬. ব্রহ্মগিরি, নাগার্জুনাকুণ্ড, পিকলিহাল, মাসকী ও ইয়েলেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থান থেকে মেগালিথিক যুগের প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মেগালিথ (সমাধিস্তূপের উপর স্থাপিত প্রস্তর) নির্মাণকারীরা অধিকাংশই বিস্তৃতশিরস্ক, আকারে লম্বা, ও দৃঢ়দেহবিশিষ্ট লোক ছিল। কিন্তু অন্ধ্র প্রদেশের আদিত্তানালুরের লোকেরা দীর্ঘশিরস্ক ও নাতি-দীর্ঘশিরস্ক ছিল। মেগালিথ নির্মাণকারীরাই বোধ হয় ভারতে ধাতুর ব্যবহারের সূচনা করেছিল। কেন না, নাগার্জুনাকুণ্ড, তেক্কলকোটা ও মাসকী হতে প্রাপ্ত নবপলীয় যুগের লোকেদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতারই প্রাচুর্য ছিল। উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী ও তক্ষশীলা হতে প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে এই সকল স্থানে দীর্ঘশিরস্ক জাতির লোকেরাই প্রথমে বাস করত, পরে সেখানে বিস্তৃত শিরস্ক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

সুতরাং এই সকল সিদ্ধান্ত থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে ক. নবপলীয় যুগের লোকেরা দীর্ঘশিরস্ক ছিল, খ. হরপ্পা এবং অন্যান্য তাম্রাশ্ম যুগের লোকেরা দীর্ঘশিরস্ক ও নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক ছিল, কিন্তু গুজরাটে ও সিন্ধুপ্রদেশে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, ও গ. মেগালিথ যুগের লোকেরা বিস্তৃতশিরস্ক ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিস্তৃতশিরস্ক জাতিসমূহের আগমন পরে ঘটেছিল। এখানে বক্তব্য যে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা দীর্ঘশিরস্ক। তারা যে ভূমধ্যগোষ্ঠীর লোক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ক্রীট দেশীয় একটি সীলমোহরও তা সমর্থন করে। এদেরই অনুসরণে বিস্তৃতশিরস্ক জাতি বাঙলাদেশে এসেছিল।

পাঁচ

একমাত্র যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে আলোচনা করলে, আমরা বাঙলাদেশের নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ সম্যকভাবে বুঝতে পারব সেই দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে হলে, আমাদের সমগ্র ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেজন্য বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক-স্বরূপ বিশদভাবে আলোচনা করবার আগে আমরা সমগ্র ভারতের একটা মোটামুটি নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিচ্ছি।

ভারতীয় জাতিসমূহের পরিমাপ প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লোক-গণনার সময় ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিভাগ (Indian Ethnographic Survey) কর্তৃক। ওই পরিমাপ গ্রহণের জন্য তৎকালীন সমগ্র ভারতের লোকগণনা-সম্পর্কিত চীফ কমিশনার ও নৃতত্ত্ব-বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যার হারবার্ট রীজলি কয়েকজন এদেশীয় সাধারণ সরকারী কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন। একথা বলা প্রয়োজন যে, নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণের জন্য স্যার হারবার্ট রীজলি নৃতত্ত্ব-বিভাগের তরফ থেকে যে সকল কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই নৃতত্ত্ব-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কেবল নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণের প্রণালী-মাত্রেই দীক্ষা দিয়ে তাঁদের স্কন্ধে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার এক গুরু দায়িত্বপূর্ণ ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের পরিমাপের বৈজ্ঞানিক সঠিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেজন্য ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় যেখানে পরবর্তী কালের অন্য কোন নৃতত্ত্ববিদ্ কর্তৃক স্বাধীনভাবে গৃহীত পরিমাপ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রীজলির পরিমাপ সব সময় তুলনা করা উচিত নয়। পরন্তু রীজলির সময় এশিয়াবাসিগণের নৃতাত্ত্বিক-স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান ছিল, বর্তমানে তা অপেক্ষা যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটেছে। এ সব কারণে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার সময় উক্ত গণনা-সম্পর্কিত চীফ কমিশনার মিঃ হাটন (Hutton) ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের (Indian Zoological Survey) নৃতত্ত্ববিদ ড. বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের উপর রীজলির এবং তৎপরবর্তী কালের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপগুলির তুলনামূলক মূল্যের উপর নির্ভর করে ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করে পরিশোধিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ভার অর্পণ করেন।

সেই পরিশোধিত সিদ্ধান্তসমূহ ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির উপর যে নূতন

আলোকপাত করেছে, তার ফলে আমরা জানতে পারি যে, ভারতের সীমান্তবর্তী হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক পর্যায় বিদ্যমান আছে। অন্তঃ-স্রোতার মত যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়টি জনবাসিগণের মধ্যে সর্বত্রই ব্যাপ্তিলাভ করেছে, সেই পর্যায়ের লোকদের বৈশিষ্ট্য—লম্বা মাথা, দীর্ঘ দেহ, ফিকে রঙের চুল ও চোখ, ও ফরসা চেহারা। পাঠান ও কাফির জাতিরা এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত, এবং পাকিস্তানের অন্তর্গত চিত্রল ও মাস্তাজের খস্ ও কাশ্মীরের পণ্ডিত জাতিগণের মধ্যে এই পর্যায়ের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বর্তমান। এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা আর্যজাতির ভারতে আগমনের সমসাময়িক কালে এই সমস্ত স্থানে এসে বসবাস শুরু করেছিল বা সেই আর্য জনস্রোতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর একটি পর্যায় যা এই সমস্ত প্রদেশে লক্ষিত হয়, তার অন্তর্ভুক্ত লোকেদের মাথা গোল, নাসিকা উন্নত, গায়ের রং ফরসা, কিন্তু চোখ ও চুলের রং মাঝামাঝি। এই গোষ্ঠী ইউরোপের ডিনারিক (Dinaric Race) পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ইউজেন ফিশার (Fisher) এর নামকরণ করেছেন 'নিকট-প্রাচ্য জাতি' (Near Eastern Race)। এই পর্যায়ের লক্ষণগুলি আংশিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় কাফির ও পাঠানগণের মধ্যে, এবং খুব বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় পাকিস্তানের চিত্রলের খস্, পাকিস্তানের গিলগিট উপত্যকার বুরিশ, ডারদী এবং সারিকল, পাকিস্তানের মাস্তাজ ও কাশ্মীরের হুনজা উপত্যকার ওয়াখিস জাতিসমূহের মধ্যে। কাশ্মীরের সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—লম্বা মাথা, উন্নত নাসিকা, গোলাপী আভাবিশিষ্ট ফরসা গায়ের রং ও বাদামী (brown) রঙের চোখ ও চুল। উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের বাদাকশানের বাদাকশিরাও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ইউজেন ফিশার এই লক্ষণবিশিষ্ট জাতিসমূহের নামকরণ করেছেন—'প্রাচ্য জাতি' (Oriental Race)। এ ছাড়া, কাশ্মীরের লাডাক উপত্যকা ও দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে আমরা একটি মঙ্গোলীয় স্তরও লক্ষ্য করি। চিয়াংপা-রা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিম নেপালের লাডাকী, লাহুলী, গুরুং ও অন্যান্য কয়েকটি জাতির মধ্যে এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি যথেষ্ট

পরিমাণে বিদ্যমান। সামান্য পরিমাণে এই বৈশিষ্ট্য লাডাকের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পুরিগি ও মাচনোপা জাতিগণের মধ্যেও বোধ হয় বর্তমান আছে।

উপরি-উক্ত নৃতাত্বিক পর্যায়গুলি পর্যালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এগুলি সমস্তই অতীতকালের আগন্তুক পর্যায়। এই অঞ্চলসমূহের আদিম বা মৌলিক অধিবাসিগণের বৈশিষ্ট্য —খাটো দেহ, লম্বা মাথা, মাঝারি নাক, চওড়া মুখ ও বাদামী রঙের গা। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই পর্যায়ের লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয় কুলুর কানেট জাতিসমূহের মধ্যে। প্রসিদ্ধ জার্মান নৃতত্ত্ববিদ আইকস্টেট (Eickstet) এই পর্যায়টির নামকরণ করেছেন 'গাড়ওয়ালি' এবং ড. বিরজাশঙ্কর গুহ এর নাম দিয়েছেন 'হিমালয়ান'।

হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল পরিত্যাগ করে পঞ্চনদে উপনীত হয়ে আমরা দেখতে পাই যে, পাঞ্জাবের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে একটা নৃতাত্বিক ঐক্য আছে। এখানকার অধিবাসিবৃন্দ হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের পাঠান ও অন্যান্য দীর্ঘশিরস্ক জাতিসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যদিও আইকস্টেট পাঞ্জাবের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে দুটি নৃতাত্বিক উপশ্রেণী নির্দেশ করেছেন, তথাপি তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের শিখগণ ও পশ্চিমাংশের মুসলমানগণের মধ্যে অবয়বগত নৃতাত্বিক কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে যে বৈষম্য সাধারণতঃ বাইরে থেকে পরিলক্ষিত হয়, তা কেবলমাত্র বেশভূষা ও কেশধারণের স্বতন্ত্রতার জন্য।

ঠিক পাশাপাশি অবস্থিত সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ কিন্তু ভিন্ন নৃতাত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকেদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অল্প-বিস্তর গোল মাথা, পাঞ্জাবীগণ অপেক্ষা খর্বতর দৈহিক দৈর্ঘ্য, গোলাকার মুখ ও প্রলম্বিত নাক। এ থেকে মনে হয় যে, সিন্ধু প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা উত্তরাঞ্চলের লম্বা মাথা বিশিষ্ট জাতিসমূহের অন্তর্গত ছিল এবং পরে কোন এক গোলমাথাবিশিষ্ট জাতির আক্রমণ ও সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান 'সিন্ধি' জাতির উদ্ভব হয়েছে।

পঞ্জাব ও হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অংশ-বিশেষে আমরা যে লম্বা মাথাবিশিষ্ট জাতি লক্ষ্য করেছি, সেই নৃতাত্বিক পর্যায়েরই আধিক্য আমরা

দেখতে পাই উত্তর প্রদেশে। বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণরা এই পর্যায়ের অন্তর্গত; তবে তাদের সঙ্গে পাঞ্জাবের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য আছে তা লক্ষিত হয় পঞ্জাবীদের দীর্ঘতর দৈহিক উচ্চতায়, বৃহত্তর মাথায়, দীর্ঘতর নাকে ও অধিকতর প্রসারিত মুখে। এই দুই প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে গায়ের রঙের কিন্তু বিশেষ বৈষম্য নেই, কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশের শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে অধিকতর ফরসা লোক পাওয়া যায়।

উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে রাজপুতানা ও মধ্য প্রদেশের অনেকগুলি জাতি নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের দিক থেকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যদিও বাঘেল রাজপুতগণের মধ্যে গোল মাথাও পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি রাজপুতানার সাধারণ নৃতাত্ত্বিক স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা মাথা ও সুন্দর উন্নত নাক। মধ্যভারতের অধিবাসিবৃন্দও এই একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই পর্যায়ের জাতিসমূহের নাসিকা সম্বন্ধে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, শতকরা ১৩ থেকে ১৪ জনের নাসিকার উপরের ভাগ গোলাকার (convex) বা কুব্জ এবং যথেষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে নাসিকার মূলদেশ সামান্য পরিমাণে অবনত দেখা যায়। এই সমস্ত জাতিসমূহের সাধারণ গায়ের রঙ বাদামী (brown) ও চুলের রঙ কালো। খুব ফিকে রঙের চোখ, চুল ও চেহারা খুব কম সংখ্যক লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি বিশিষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে গোলাপী আভাবিশিষ্ট গায়ের রঙ ও ঘোর বর্ণের চুল ও চোখ দেখা যায়।

কাথিয়াবার ও গুজরাটের অধিবাসিবৃন্দের কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোল মাথা। যদিও নাগর এবং বেনিয়া-জৈন, ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং ঔদিব ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি পারস্পরিক নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে, কুবী ব্রাহ্মণদের কিন্তু ঔদিব ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য সূচিত হয় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কুবীরা গুজরাটে এসেছিলেন—এই জনশ্রুতিও তাদের উপরি-উক্ত নৃতাত্ত্বিক স্বতন্ত্রতাকে সমর্থন করে।

যদিও গুজরাটের জাতিসমূহের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তথাপি তাদের পরস্পরের গায়ের রঙের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়; নাগর ব্রাহ্মণরা দেখতে সর্বাপেক্ষা ফরসা এবং তাদের প্রায় কাছাকাছি রঙ হচ্ছে ব্রহ্মক্ষত্রিয়দের। বেনিয়া-জৈনদের গায়ের রঙ ময়লা, এবং কাথিদের গায়ের রঙ আরও ময়লা।

ভারতের উপদ্বীপাংশকে (Peninsular India) মোটামুটি দুই ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমাংশ বিন্ধ্য-পর্বত থেকে শুরু করে নীলগিরি শৈলমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর নাম দাক্ষিণাত্য। দ্বিতীয়াংশ ১৪ ডিগ্রি উত্তর-অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের অবশিষ্ট দক্ষিণাঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশকেই বলা হয় দাক্ষিণাত্য এবং এই প্রদেশের প্রধান জাতিসমূহ হচ্ছে দেশস্থ ব্রাহ্মণ, করহাদ ব্রাহ্মণ, কুন্বী ও মারাঠা। চিৎপাবন, সারস্বত, প্রভুকায়স্থ প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-দেশবাসী অন্যান্য জাতিসমূহ অন্য অঞ্চল হতে এসে এই অঞ্চলে বসবাস করছে বলে মনে হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক জারম্যানো ডি সিলভা-র (Germano-de Silva) এক শিষ্য প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, গোয়া-অধিবাসী সারস্বত জাতির সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার গৌড়দেশের ব্রাহ্মণগণের নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে।

মোটামুটিভাবে মহারাষ্ট্র দেশের জাতিসমূহ বিস্তৃতশিরস্ক (brachycephalic) এবং দীর্ঘ (leptorrhine) হতে নাতিদীর্ঘ (mesorrhine) নাসা।

চিৎপাবনরা সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ। অন্যান্য জাতিসমূহ ওদের চেয়ে ময়লা। দেশস্থ, মারাঠা ও সারস্বতগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক পিঙ্গলবর্ণ (tawny) ত্বকও পরিলক্ষিত হয়। পরস্পরের মধ্যে চোখ ও চুলের রঙেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবে এবিষয়ে চিৎপাবন, প্রভুকায়স্থ ও সারস্বতগণের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ blonde elementও দেখতে পাওয়া যায় এবং ভারতবাসিগণের মধ্যে তারাই সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ ও তাদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কটা মাথার চুল ও চোখ পরিদৃষ্ট হয়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ড. বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয় বোম্বাইয়ের পারসীজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে, তারা অতি মাত্রায় বিস্তৃতশিরস্ক (brachycephalic), তাদের নাসিকা দীর্ঘ, উন্নত ও প্রায়ই কুব্জ (aquiline), এবং তাদের মুখ বিস্তৃত, কিন্তু অল্প-বিস্তর ছোট। যদিও পারসীরা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের দিক থেকে ভারতের অন্যান্য জাতিসমূহ হতে পৃথক শ্রেণীভুক্ত, তথাপি তাদের সঙ্গে জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বী প্রাচীন পারসীক জাতির কোন নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য নেই। প্রাচীন পারসীক জাতিরা দীর্ঘশিরস্ক (dolicho-cephalic) ও দীর্ঘ নাসা (leptorrhine) এবং তাদের মুখ লম্বা। এ বিষয়ে

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার আর্য-ভাষাভাষী জাতিগণের সঙ্গে তাদের নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য খুব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে খুব নিকটতম ঘনিষ্ঠতা আছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র এই যে গুজরাট রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে বিস্তৃতশিরস্কতা (brachycephaly) খুব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয় এবং তাদের নাকও বেশী পরিমাণে দীর্ঘ ও সুন্দর। ড. বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয় অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মধ্যভারত হতে মহারাষ্ট্রদেশে একটি সাধারণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের আগমন ঘটেছিল, এবং পশ্চিম ভারতে ওই পর্যায়ের উপর কোন এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতি এসে নৃতাত্ত্বিক প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠী ছাড়া আরও অনেক জাতি আছে। যেমন কর্ণাটক, দক্ষিণ-পশ্চিম অন্ধ্র প্রদেশ ও দক্ষিণাপথের সম-মালভূমির পশ্চিমাংশের কন্নড় জাতিসমূহ, উত্তর ও পূর্বাংশের তেলেগু ভাষাভাষী জাতিসমূহ ও মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যবর্তী দক্ষিণ কানারার কানাড়া বা কন্নড় ভাষার সহিত সম্পর্কিত তুলুভাষী জাতিসমূহ। শিরাকার জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা (cephalic index) ৭৮'০ থেকে ৮০'৪ পর্যন্ত এবং নাসিকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা (nasal index) ৭২'২ থেকে ৭১'৪ পর্যন্ত। তার মানে তুলুরা অল্পবিস্তৃত-শিরস্ক ও দীর্ঘনাসা। তুলুভাষী জাতিসমূহের মধ্যে কন্যাগত উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে, এবং যদিও তারা মৃতের শব দাহ করে, তবুও সমাধিস্থ করার প্রথাও তাদের মধ্যে অজ্ঞাত নয়। মৃতকে যখন তারা সমাধিস্থ করে, তখন তারা ওই স্থানের উপর কোণাকার সমাধি স্তূপ নির্মাণ করে।

কর্ণাটকের কানাড়া-ভাষী জাতিসমূহের শিরাকার জ্ঞাপক ও নাসিকাকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭'৩ ও ৭৩'৫। বেলারী ও কুর্নুল জেলার কানাড়া-ভাষী জাতিসমূহের মাথা কিন্তু কিছু বেশী দীর্ঘ ও নাকও কিছু বেশী বিস্তৃত। তাদের শিরাকারজ্ঞাপক ও নাসিকাকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮'৮ ও ৭৫'৩। ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কানাড়া-ভাষী ব্রাহ্মণদের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মাথা গোল (শিরাকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৯'৭৪) এবং তাদের নাক লম্বা (নাসিকাকার জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা ৭১'২০)। কয়েক ক্ষেত্রে কুব্জ নাসিকাও (aquiline) দেখা

গিয়েছে। ব্রাহ্মণদের দেহদৈর্ঘ্য (stature) অব্রাহ্মণ জাতিসমূহ অপেক্ষা কম, কিন্তু অব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ ব্রাহ্মণদের চেয়ে ময়লা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাল বা পিঙ্গলযুক্ত বাদামী। চোখের রঙ ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ উভয়ের ঘোর বাদামী বা কাল—যদিও খুব অল্প সংখ্যকের মধ্যে ফিকা রঙও দেখতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্বাংশে ও গঞ্জাম থেকে সংযুক্ত জেলাসমূহের উপকূলভাগে যে সমস্ত জাতি বাস করে, তাদের নাম অন্ধ্র। অন্ধ্রদের শিরাকার জ্ঞাপক ও নাসিকাকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭·৬ এবং ৭৫·৪। তার মানে তারা নাতিদীর্ঘশিরস্ক ও নাতি-দীর্ঘনাসা। মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলের অন্ধ্রদের মধ্যে দুটি প্রধান জাতি, যথা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য কুমটিদের দেহ-দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি। মুখ লম্বা এবং নাক অল্পবিস্তর লম্বা ও উন্নত। ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ অন্যান্য জাতির চেয়ে ফিকে। কিন্তু চোখের রঙ সকলেরই কাল থেকে ঘোর বাদামী। চুলের রঙ খুব বিশিষ্টভাবে কাল, এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে নাক খুব বিকৃত।

ভারতীয় উপদ্বীপের ১৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের তলভাগস্থ ভূভাগের অধিবাসিবৃন্দকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রথম, কেরালা ও পশ্চিম উপকূলের মালয়ালীভাষী জাতিসমূহ ও দ্বিতীয় পূর্ব-উপকূলের তামিল-ভাষাভাষী জাতিসমূহ। কেরালায় মালয়ালী ভাষাভাষী জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক ও দীর্ঘনাসা। তাদের মধ্যে নাম্বুদ্রী, নায়ার ও ইলুবার জাতিসমূহ যথাক্রমে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর প্রতিভূ-স্বরূপ। নাম্বুদ্রীরা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায়, নায়াররা মধ্যাকায় ও ইলুবারা খর্বকায়। নাম্বুদ্রীরা সর্বাপেক্ষা ফর্সা, নায়ারদের গায়ের রঙ বাদামী থেকে পিঙ্গলযুক্ত বাদামী, ও ইলুবারা সর্বাপেক্ষা মলিন। চোখের রঙ সকলেরই কাল থেকে ঘোর বাদামী এবং চুলের রঙ কাল, অল্প সংখ্যকের মধ্যে ফিকে রঙও পরিদৃষ্ট হয়। নাম্বুদ্রীদের মুখের আকার নায়ারদের অপেক্ষা লম্বা এবং তাদের নাকের গঠনও বেশ উন্নত। মনে হয় নাম্বুদ্রীরা বহির্দেশ থেকে কেরালায় এসে বসবাস করছে, কিন্তু নায়ারদের সঙ্গে 'সম্বন্ধম্' নামক বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার জন্য উভয়ের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তামিলনাড়ুর তামিল ভাষাভাষী জাতিসমূহও দীর্ঘশিরস্ক, কিন্তু তাদের নাক ঠিক মালয়ালী ভাষাভাষীদের মত দীর্ঘ নয়। তামিল ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ

বিশেষভাবে ঘোর বাদামী, এবং চেট্টিও কাদ্‌দাদের যথাক্রমে পিঙ্গলযুক্ত বাদামী থেকে গভীর পিঙ্গলযুক্ত বাদামী। চোখ ও চুলের রঙ সকলেরই কাল।

তবে তামিলভাষাভাষী জাতিসমূহের যে পরিমাপ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন পর্যায় বর্তমান—একটি দীর্ঘশিরস্ক ও আরেকটি বিস্তৃতশিরস্ক পর্যায়। এ দুটি পর্যায় যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চবর্ণের তামিল ভাষাভাষীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ড. বিরজাশঙ্কর গুহ বলেন যে, যদিও তামিল ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে একটি দীর্ঘশিরস্ক অন্তস্তর খুব প্রবলভাবে বর্তমান, তবুও বিস্তৃতশিরস্ক পর্যায়ের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটেছে। নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের দিক দিয়ে তাদের স্থান কানাড়া ভাষাভাষী জাতিসমূহের ঠিক মাঝামাঝি এবং এ বিষয়ে দ্রাবিড়-ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে তেলেগু-ভাষাভাষিগণের সঙ্গে মালয়ালী ভাষাভাষিগণের সর্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধ আছে। পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতে আমরা যে বিস্তৃতশিরস্ক পর্যায় দেখি, সেই একই পর্যায়ের সংমিশ্রণে দ্রাবিড় জাতিসমূহের মধ্যে যে বিস্তৃতশিরস্কতার উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ছয়

নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাচ্য ভারত তিনভাগে বিভক্ত—বিহার, বাঙলা ও ওড়িষা। এই তিন প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দের প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের বিস্তৃতশিরস্কতা। পশ্চিমে এই পর্যায়ের অস্তিত্ব আমরা বারাণসীর পূর্ব-প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ্য করি। বিহার প্রদেশে এই পর্যায় বেশ ব্যাপকভাবে বর্তমান; কিন্তু বাঙলাদেশেই এই পর্যায় বিশেষভাবে ঘনীভূত হয়েছে। ওড়িষার অধিবাসি-বৃন্দ এই পর্যায়েরই দক্ষিণতম প্রতিনিধিস্বরূপ।

এই পর্যায়ের উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্যার হারবার্ট রীজলি বাঙলার অধিবাসিবৃন্দকে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ জাতিগণকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং যেহেতু বিস্তৃতশিরস্কতা ও বিস্তৃত-

নাসিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য, এবং এই দুই লক্ষণ উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্যতীত উপরি-উক্ত অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেই হেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাদের এই দুই নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত। কিন্তু রীজলি বাঙলায় যে সকল জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের উপর ভিত্তি করে উপরি উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সকল জাতি যদিও বাঙলার রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে বাস করে, তথাপি তারা সকলে বাঙালী বলতে যা বুঝায়, তা নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙলার উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিসমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগণের সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগগণ (যাদের পরিমাপ রীজলি নিজের মত পোষণের জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি জাতিগণের পরিমাপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছিলেন), মোটেই বাঙলাদেশের মৌলিক অধিবাসী নয়। তারা ইন্দোচীন নামক মঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্তর্গত এবং মাত্র কয়েক শত বর্ষ পূর্বে আরাকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। তাদের বিচিত্র সামাজিক সংগঠন, ও আহং, দেপোটাং, পাংডুং, খাকায়, খিয়াংগা প্রভৃতি অবাঙালী নাম থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঠিক এইভাবে, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোচগণ ঐতিহাসিকালে উত্তরবঙ্গ-বিজেতা মঙ্গোলীয় পর্যায়সম্ভূত কোচজাতির বংশধর মাত্র। পাইয়া, লেথক, লবু, অলিজ, এয়া, তানডু, পোবাই প্রভৃতি এদের নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালীর নাম। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মালজাতিগণ রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল হতে বাঙলাদেশে এসে বসবাস করেছে এবং তারা সাঁওতাল পরগণার মাল-পাহাড়িয়া, মাল প্রভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন। বাঙলার সীমান্তাংশবাসী এই সমস্ত অবাঙালী উপজাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাঙলাদেশের জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণ করা যে সম্পূর্ণ অসমীচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রথম প্রমাণ করতে প্রয়াস পান যে, বাঙালীজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে রীজলির মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরে

ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দের মতবাদকে যে সমর্থন করে, মাত্র তা' নয়, বাঙলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির উপর নূতন আলোকপাত করে।

গুহ মহাশয় বাঙলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং চব্বিশপরগণার পোদজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পায় যে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মাথা গোলাকার (শিরাকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৮·৯৫) নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহ-দৈর্ঘ্যের গড় ১৬৮০ মিলিমিটার। কায়স্থদের মাথা ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশী গোল (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৮০·৮৪), নাসিকা প্রায় সমানভাবেই উন্নত ও দীর্ঘ। ও দেহ-দৈর্ঘ্য সামান্য পরিমাণে কম (১৬৭০ মিঃ মিঃ)। পোদদের দেহ-দৈর্ঘ্য সবাপেক্ষা কম (১৬২৮ মিঃ মিঃ), মাথা কম গোল (শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৭·১০), মুখ ছোট ও অপ্রসারিত এবং নাক ছোট ও কম উন্নত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ বাদামী, কিন্তু পোদদের গায়ের রঙ গভীর বাদামী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যকের চোখ ঘোর বাদামী, কিন্তু পোদদের চোখ অধিক পরিমাণে কাল। চুলের রঙ সকলেরই কাল।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙালী জাতির বিস্তৃত-শির ও প্রসারিত-নাসিকা দেখে, তারা দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত বলে রীজলি সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু রীজলির এই মতবাদের সপক্ষে কোনই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। মঙ্গোলীয় জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষে তারা আগন্তুক মাত্র। সুতরাং পূর্বভারতের জাতিসমূহের বিস্তৃতশিরস্কতা যদি মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, মঙ্গোলীয় জাতি কর্তৃক বাঙলা দেশে কোন বৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এরূপ কোন আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাস কোন সাক্ষ্য দেয় না। অধিকন্তু বাঙালী জাতির আকৃতির মধ্যে এমন কোন নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ বা তাদের মধ্যে প্রচলিত এমন কোন জনশ্রুতি বা কাহিনী নেই, যা দ্বারা তাদের মঙ্গোলীয় উৎপত্তি সমর্থিত হয়। পরন্তু, নেপাল ও আসামে এরূপ অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, এবং এটাও আমরা জানি যে, এ সকল দেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে (১১ অধ্যায়) যে কাহিনী আছে,

সেই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে পুরু (যযাতিপুত্র) বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজার পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। বলি রাজার এই পাঁচ সন্তান যে পাঁচটি রাজ্য শাসন করতেন, তাঁদের নাম থেকেই এই পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। বলি রাজার এই পাঁচটি পুত্র বালেয় ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হয়েছেন, এবং তাঁরাই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। মৎস্য (৮৮।২৪।২৮) ও বায়ু পুরাণেও (৯৯।২৭) উক্ত হয়েছে যে, বলিরাজার পুত্রগণই জগতে চারি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রীজলি কেন বাঙালী জাতিকে মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে—তার প্রধান কারণ বাঙালী জাতির বিস্তৃত-শিরস্কতা। কিন্তু বিস্তৃত-শিরস্কতা এক মাত্র মঙ্গোলীয় জাতিরই বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুতঃ বিস্তৃতশিরস্কতা ব্যতীত মঙ্গোলীয় জাতির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও আছে, যা মঙ্গোলীয় জাতি ছাড়া অন্য জাতিসমূহের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। যেমন, তাদের ঋজু সরল চুল, চোখের খাঁজ (epicanthic fold), গণ্ডাস্থির প্রাধান্য, পীতাভ গায়ের রঙ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত মঙ্গোলীয় লক্ষণ বাঙালীদের মধ্যে নেই। উপরন্তু, দীর্ঘশিরস্ক মঙ্গোলীয় জাতিও যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

এটা সত্য যে বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় জাতি-সম্ভূত। কিন্তু এই সম্পর্কে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও বাঙলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের ভুটিয়া, ল্যাপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিস্তৃতশিরস্ক, তথাপি উত্তর বঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ, যদিও পূর্ব-সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক, পূর্ববাঙলার বাঙালীরা কিন্তু বিস্তৃতশিরস্ক। কগিন ব্রাউন ও এস. ডব্লিউ. কেম্প পূর্ব-সীমান্তের আবর জাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে শতকরা গড়ে ৩২ জন দীর্ঘশিরস্ক ও মাত্র ৬ জন বিস্তৃত-শিরস্ক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পরস্পর সান্নিধ্য-হেতু বাঙলার অধিবাসি-বৃন্দের সঙ্গে যদি সীমান্ত-প্রদেশস্থ মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে থাকত, তা হলে উত্তর বিভাগে এটা বাঙালীর বিস্তৃত-শিরস্কতায় ও পূর্ব বিভাগে দীর্ঘ-

শিরস্কতায় প্রতিফলিত হত। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের বিস্তৃতশিরস্ক জাতি-সমূহ একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত এবং তারা উত্তর ভারতের দীর্ঘশিরস্ক নৃতাত্ত্বিক পর্যায় থেকে পৃথক। পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের এবং উত্তর প্রদেশের জাতিসমূহের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নীচে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট প্রকাশ পায়—

জাতি	শির-সূঃ	নাসিকা-সূঃ	দেহ দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
নাগর ব্রাহ্মণ	৭৯·৭	৭৩·১	১৬৪৩
গুজরাটী বেনিয়া	৭৯·০	৭৫·৭	১৬১২
প্রভুকায়স্থ	৭৯·৯	৭৫·৮	১৬২৭
*বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮·৮	৭০·৮	১৬৭৬
*বাঙালী কায়স্থ	৭৮·৪	৭০·৭	১৬৩৬
উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ	৭৩·১	৭৬·৬	১৬৫৯
উত্তর প্রদেশের কায়স্থ	৭২·০	৭৪·৫	১৬৪৮
বিহারী ব্রাহ্মণ	৭৪·৯	৭৩·২	১৬৬১

পশ্চিম ও প্রাচ্য-ভারতের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত সাদৃশ্য থাকা হেতু, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত উপায় নেই যে, অতি প্রাচীন কালে কোন বিস্তৃতশিরস্ক জাতির লোকেরা বহু সংখ্যায় গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় বাঙলা দেশেও এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে—এরা কারা? এর জবাব দেওয়া খুবই সহজ।

এই বিস্তৃতশিরস্ক জাতির আদিম অধিবাস সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চনদের পশ্চিমে বালুচিস্তান ও আফগানিস্থানের বালুচ ও পাঠান জাতীয় লোকগণ আর্য ভাষাভাষী এবং নাতিদীর্ঘশিরস্ক

* ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে—

বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮·৯	৬৭·১	১৬৬০
বাঙালী কায়স্থ	৮০·৮	৬৮·১	১৬৭০

(mesaticephalic) ; এদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতা ও বিস্তৃত-শিরস্কতা যথাক্রমে ইরানীয় ও তুরানীয় জাতিসমূহ হতে প্রাপ্ত, এই সিদ্ধান্ত করে স্যার হারবার্ট রীজলি এদের 'তুর্ক-ইরানীয়' পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের জাতিসমূহের সম্পর্কে উজফালভী (Ujfalvy) ও স্যার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) যে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছিলেন তার ফলে আমরা জানতে পারি যে, বালুচ ও পাঠান, গুজরাটী, মারাঠী, কুর্গ এবং বাঙালী ও ওড়িয়া জাতিসমূহের বিস্তৃতশিরস্কতার জন্য আমাদের তুর্ক, শক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিসমূহকে টেনে আনবার কোন প্রয়োজন নেই। আগেই বলা হয়েছে যে তুর্ক, শক ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের নিজেদের যে সকল নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা এসকল জাতিগণের মধ্যে মোটেই নেই। পরন্তু, পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের জাতিসমূহের সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে টি. এ. জয়েস (T A. Joyce) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাকলামাকান মরুদেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহের জাতিগণের মধ্যে একটা মোটামুটি নৃতাত্ত্বিক ঐক্য আছে। এই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়টি আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় লক্ষ্য করি ওয়াখিগণের (Wakhis) মধ্যে। এই অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে তার জটিলতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করবার মত বস্তু এই যে পামির ও তাকলামাকান মরুদেশের আদিম অধিবাসিরা আলপাইন (Alpine) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র পশ্চিমে ইন্দো-আফগান পর্যায়ের সঙ্গে এদের কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে এই সকল অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের ওপর মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব নেই বললেই হয়। এই অঞ্চলের পর্যায়গুলির নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি এরূপ—

প্রথম পর্যায়—বিস্তৃতশিরস্ক, গোলাপী আভাবিশিষ্ট গৌরবর্ণ ত্বক, দেহ দৈর্ঘ্য গড়ের ওপর, পাতলা উন্নত দীর্ঘনাসিকা—তা সরল থেকে কুব্জ, লম্বা ডিম্বাকৃতি মুখ, বাদামী রঙের চুল—সাধারণতঃ খুব ঘোর এবং তা প্রচুর ও ঢেউখেলান, ও চোখ প্রধানতঃ মধ্যম শ্রেণীর। এরা লা পুজের (La Pouge) আলপাইন পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়—বিস্তৃতশিরস্ক, গায়ের রঙ ফর্সা, কিন্তু সামান্য বাদামী আভা-বিশিষ্ট ; দেহ-দৈর্ঘ্য গড়ের ঊর্ধ্বে ; নাক সরল, কিন্তু প্রথম পর্যায় অপেক্ষা বিস্তৃত ; গণ্ডাস্থি চওড়া ; চুল প্রথম পর্যায় অপেক্ষা সরল—তা ঘোর বর্ণ ও অপ্রচুর ; চোখ কাল। এরা তুর্কী পর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় পর্যায়—নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক, দীর্ঘ দেহ, পাতলা উন্নত কুব্জ নাসিকা, লম্বা ডিম্বাকৃতি মুখ, কাল ঢেউখেলান চুল ও কাল চোখ। এরা ইন্দো-আফগান পর্যায়ভুক্ত।

পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পামির ও তাকলামাকান মরু অঞ্চলে বিস্তৃত-শিরস্ক এক জাতি বাস করত। এরা পাশ্চাত্য ইয়োরোপে প্রচলিত ইটালো-সেলটিক ভাষার অনুরূপ এক আদি-আর্যভাষী ছিল এবং পশ্চিম ইয়োরোপের অধিবাসিবৃন্দ ও এরা বিস্তৃতশিরস্ক পর্যায়-ভুক্ত বলে এদের নামকরণ করা হয়েছে 'অ্যালপাইন' পর্যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বালুচিস্তানে এই পর্যায় বৈদিক আর্য ও দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে, তথায় নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক 'ইন্দো-আফগান' পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই একই পর্যায় ভারতের অন্তরেও আদিম অধিবাসিগণ (Proto-Australoid), বৈদিক আর্য এবং দ্রাবিড় জাতির সহিত সংমিশ্রিত হয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেন যে 'অ্যালপাইন পর্যায়ভুক্ত' বিস্তৃতশিরস্ক জাতি-সমূহ বৈদিক আর্যদের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে এসে আর্যাবর্তের দেশসমূহ বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক অধিকৃত দেখে পশ্চিম উপকূল ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভূমির ভিতর দিয়ে গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাদেরই অপর এক শাখা কাথিয়াবাড়, গুজরাট ও পশ্চিম ভারতে বসবাস শুরু করে। কিন্তু অপর পক্ষে, এরূপ সিদ্ধান্ত করবার সপক্ষেও যথেষ্ট কারণ আছে যে অ্যালপাইন পর্যায়ভুক্ত একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশঃ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাড় ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয়, তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে সমুদ্রপথে আর্যদের পূর্বেই ভারতে এসে পৌঁছেছিল।

বাঙালী যে মঙ্গোলীয় জাতিসম্ভূত নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়েছি। দ্রাবিড় জাতির সঙ্গেও তাদের খুব বেশী রক্ত-সম্বন্ধ নেই। রীজলির সময়ে দ্রাবিড় জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত। এবং সেজন্যই তিনি বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক-গঠনে দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্য-ভাষীগণের ন্যায় দ্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগন্তুক মাত্র। তাদের পূর্বে ভারতে প্রাক্‌-দ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতি-সমূহ বাস করত এবং তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। তাদের বংশধরগণকেই আজ আমরা ভারতের বনে, জঙ্গলে, ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহে দেখতে পাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙালীর মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ প্রাক্‌-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তবে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী যে অ্যালপাইন পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত নৃতত্ত্ববিদগণ এটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। একথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আজ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে যে সকল পদবী প্রচলিত আছে (যেমন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, গুপ্ত, নাগ, পাল, সেন, চন্দ্র, প্রভৃতি) এগুলি এক সময় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ড. দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ভারতে ওই একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত নাগর-ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ পদবীর প্রচলন আছে। বোধ হয় এক সময়ে এগুলি অ্যালপাইন পর্যায়ের উপশ্রেণীর (tribes) নাম মাত্র ছিল, এবং পরে বর্ণসৃষ্টির সময়ে সেগুলি জাতিবাচক পদবী হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক-পরিচয়-সম্পর্কিত এই আলোচনার ফলে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঙালী জাতি রীজলির তথাকথিত মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়-গোষ্ঠী সম্ভূত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ

যদিও উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা 'আলপাইন' বা 'আলপীয়' পর্যায়ভুক্ত, তথাপি তাদের নিয়েই বাঙলার নৃতাত্ত্বিক সত্তা গঠিত হয় নি। আলপীয়রা ছিল বাঙলায় আগন্তুক জাতি। সুতরাং তাদের আসবার আগেও, বাঙলায় লোক বাস করত। তারা কোন্ জাতিভুক্ত? তারই আলোচনা আমরা এখানে করব।

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের বলা হয় আদি-অস্ত্রাল। আদি-অস্ত্রাল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের মিলও আছে। মানুষের রক্ত সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—'ও', 'এ', 'বি' এবং 'এ-বি'। ভারতের প্রাক্-দ্রাবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, এই উভয়ের রক্তেই 'এ' এগ্লুটিনোজেনের ('A' Agglutinogen) শতকরা হার খুব বেশী। তা থেকেই উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোঝা যায়।

এক সময় আদি-অস্ত্রালদের ব্যাপ্তি উত্তর-ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। নৃতত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন যে, আনুমানিক ৩০,০০০ বৎসর পূর্বে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে প্রথম পৌঁছায়।

আদি-অস্ত্রাল জাতির লোকেরা খর্বাকার ও তাদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কাল ও মাথার চুল ঢেউখেলান। তিনেভেলী জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা 'নিষাদ'-জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে তারা অনাস, তাদের গায়ের রঙ কাল ও তাদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভুত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের নিষাদরাই যে আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন উপজাতি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মনে হয় এই মূল-জাতির এক শাখা দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করে,

সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মেলেনেশিয়ায় যায় ও সেখান থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌছায়।

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা এই গোষ্ঠীরই লোক। এদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আগন্তুক দ্রাবিড় ভাষাভাষী কোন কোন উপজাতি। দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আলপীয়দের আসবার আগে। এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে। সেজন্য নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের 'ভূমধ্য' বা 'মেডিটেরেনিয়ান' নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়। এদের আকৃতি মধ্যাকার এবং মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও সরলা। আদি-মিশরীয়দের সঙ্গে এ জাতির বেশী মিল আছে। অন্ধ্রপ্রদেশের আদিত্তান্নালুর অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রে ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে, তাদের অধিকাংশই ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর লোক। খুব সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পনি'রা এ গোষ্ঠীরই লোক ছিল।

এই আদি-অস্ত্রাল ও ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর লোকেদের সংমিশ্রণেই বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠিত হয়েছিল। এরা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত। আদি-অস্ত্রালরা যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষাকে বলা হয় 'অষ্ট্রিক'। এই 'অষ্ট্রিক' ভাষাই বাঙলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। কেন না, বাঙলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত এই ভাষার শব্দসমূহের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। ভারতে এই ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে 'মুণ্ডারী' ভাষা—যে ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, জুয়াড়, কোরকু প্রভৃতি জাতিসমূহ ব্যবহার করে। যদিও অষ্ট্রিক ভাষার শব্দসমূহ ভারতের সব ভাষার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও বাঙলা ভাষায় এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। অষ্ট্রিক ভাষাভাষী জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে 'কুড়ি' সংখ্যাকে ভিত্তি করে উচ্চতর সংখ্যা প্রকাশ করা।

অনুরূপভাবে আমরা বাঙলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষারও অনেক শব্দ পাই। দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরা যে কোন এক সময় পূর্ব ও মধ্য-ভারতে ছিল, তা ওড়িষায় কুই বা কন্ধ, পারজি ও গদ্বার, বিহারের কুরুখ ও ওঁড়াও, রাজমহল পাহাড়ের মালতো ও মধ্যপ্রদেশের কোলামি জাতিসমূহের ভাষা থেকে বুঝতে পারা যায়। এগুলি সবই দ্রাবিড় জাতীয় ভাষা হতে উদ্ভূত।

বাঙলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর হচ্ছে বাঙলার উপজাতি সমূহ। এ

ছাড়া, হিন্দু সমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর লোক। বাঙলার এই সকল জাতিসমূহকে আগে 'অনুন্নত' সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হত। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন-বিধানে হিন্দুসমাজভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে 'তফসীলভুক্ত জাতি' বলে বর্ণনা করা হয়। অনুরূপভাবে উপজাতিসমূহকে 'অনুন্নত উপজাতি' বলা হত। স্বাধীনতা লাভের পর যখন ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়, তখন এদের নামকরণ করা হয় 'তফসীলভুক্ত উপজাতি'। তফসীলভুক্ত উপজাতি-সমূহের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে, যথা—১. উপজাতি হতে তাদের জন্ম, ২. আদিম জীবনযাত্রা-প্রণালী, ৩. দুর্গম্য স্থানে বাস ও ৪. অনুন্নত অবস্থা।

১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'তফসীলভুক্ত' জাতিসমূহের লোকসংখ্যা ছিল ৬৮,৯০,৩১৪, আর 'তফসীলভুক্ত উপজাতি' লোকের সংখ্যা ছিল ২০,৫৪,০৮১। সুতরাং উভয়ে মিলে দেশজ জাতিসমূহের লোকসংখ্যা ছিল ৮৯,৪৪,৩৯৫ বা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ২৫.৫ শতাংশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যার তারা ছিল ৩১.৪৯ শতাংশ। তার মানে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুজনগণের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছে এই পর্যায়ভুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে সাঁওতালরা। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১২,০০,০১৯। তার পরেই হচ্ছে ওঁরাওরা। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২,৯৭,৩৯৪। আর তার পরে হচ্ছে মুণ্ডা। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১,৬০,২৫৫। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪১টি উপজাতি আছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা ও ওঁরাওদের বাদ দিলে বাকি ৩৮টি উপজাতিসমূহের প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা একলক্ষের কম। এদের মধ্যে আবার অনেকের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। যেমন বৈগাদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৪, আর কিষাণদের হচ্ছে ৩। তবে মুণ্ডাদের পরে যাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ আছে, তারা হচ্ছে যথাক্রমে ভূমিজ, কোরা ও লোধা। ভূমিজদের সংখ্যা হচ্ছে ৯১,২৮৯, কোরাদের ৬২,০২৯ ও লোধাদের ৪০,৮৯০। এরা সকলেই বাঙলার

আদিম অধিবাসী। আর অন্যান্য যে সকল সংখ্যালঘু উপজাতি আছে, তারা মনে হয়, অন্য অঞ্চল থেকে বাঙলায় প্রবেশ করে এখানে বাস করছে।

সাঁওতালরাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা-গরিষ্ঠ উপজাতি। সুতরাং প্রথমেই সাঁওতালদের কথা বলা যাক। সাঁওতালরা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম; হুগলী ও মালদহ জেলায় বাস করে। কিন্তু সাঁওতালদের বাসস্থানের পরিধি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের যে সংখ্যা, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক সাঁওতাল বাস করে ওড়িষার ময়ূরভঞ্জে, বিহারের ঝাড়খণ্ডে (সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ,মানভূম ও সিংভূম জেলায়)। অবশ্য এ সব অঞ্চলগুলি পূর্বে বাঙলাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৪-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত দামিন-ই-কো অঞ্চল থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইংরাজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাকে 'খেরওয়ারী হুল' বা সাঁওতাল-বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। খেরওয়ারী-হুল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাঁওতালরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'খেরওয়ারী' ভাষায় কথা বলে। মনে হয় প্রাচীন অঙ্গদেশেই সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল। পরে তারা বাঙলাদেশের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কেন না, সাঁওতালদের মধ্যে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেই কিংবদন্তী অনুযায়ী পূর্বে তাদের নাম ছিল খারবার। 'খর' শব্দ 'হর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'হর' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মানুষ'। পরে তারা যখন মেদিনীপুর জেলার সাঁওতা পরগণায় এসে বসবাস শুরু করে, তখন তাদের নাম হয় সাঁওতাল। বর্তমানেও পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাঁওতাল বাস করে মেদিনীপুর জেলায়। এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের সাঁওতা পরগণাতেই তাদের প্রথম বাস।

সাঁওতালরা আদি-অস্ত্রাল প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা হচ্ছে এই যে, সুদূর অতীতে কোন এক সময় এক হাঁসহাক (বন্যহাঁস) দুটি ডিম প্রসব করেছিল। এই ডিম দুটি হতে পিলচু হরম ও পিলচু বুড়ী নামে যথাক্রমে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তারাই সাঁওতাল জাতির আদি পুরুষ ও তাদের থেকেই সাঁওতালদের

সাতটি উপশাখার উৎপত্তি হয়। বর্তমানে সাঁওতালদের মধ্যে ১১টি বহির্বিবাহের গোষ্ঠী আছে, এক সময় নাকি আরও একটি ছিল, কিন্তু সেটি লুপ্ত হয়ে গেছে। সাঁওতালদের মধ্যে কিস্কু বা মুর্মু গোষ্ঠীর মর্যাদা অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক উচ্চ।

আরও, সাঁওতালদের নিজেদের মধ্যে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সে অনুযায়ী সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল হিহিরি বা অহিরিপিরি-তে। স্ক্রেসরাডের (Skresrud) মতে এটা 'হির' শব্দ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে, এটা হাজারিবাগ জেলার অন্তর্ভুক্ত অহুরি পরগণাকে ইঙ্গিত করে। যা হউক, এই আদি বাসস্থান থেকে তারা পশ্চিম দিকে খোজকামান নামে এক স্থানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে অগ্নিবৃষ্টির ফলে তারা সকলেই বিনষ্ট হয়েছিল। মাত্র একটি দম্পতি হর নামক পর্বতের ফাঁকে আটকে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল। হর পর্বত থেকে তারা সাওঙবেরা নামে নদী উপত্যকায় এসে আশ্রয় লাভ করে, এবং পরে জরপি নামক স্থানে গিয়ে পৌছায়। সেখানে তারা মরাঙবুরু নামে এক পাহাড়ের সম্মুখীন হয়। সেটা তারা সহজে ভেদ করতে অক্ষম হয়। পাহাড়ের দেবতাকে তারা বলিদান দ্বারা প্রশমিত করে, এবং একটা গিরিপথ দেখতে পায়। এই গিরিপথের ভিতর দিয়েই তারা আহিরি দেশে এসে উপস্থিত হয়, এবং সেখানে কিছুকাল বাস করে। পরে তারা সেখান থেকে যথাক্রমে কেনদী, চৈ ও চম্পায় এসে উপস্থিত হয়। চম্পায় তারা অনেক পুরুষ বাস করে, এবং পরে যখন হিন্দুরা তাদের তাড়িয়ে দেয়, তখন তারা সাঁওতাল পরগণায় এসে উপস্থিত হয়। এ থেকে একটা কথা প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে যে তখন সাঁওতাল পরগণায় হিন্দুপ্রাধান্য বিশেষ ছিল না।

মুণ্ডারা ওরাঁওদের চেয়ে সংখ্যায় কম হলেও, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের ভাষা একই গোত্রভুক্ত। সাঁওতাল এবং মুণ্ডা—এই উভয় জাতিই অষ্ট্রিক ভাষার উপ-শাখায় কথা বলে। কিন্তু ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্ভুক্ত কুরুখ ভাষায় কথা বলে। মুণ্ডারা বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম-দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায়। তবে সংখ্যায় তারা সবচেয়ে বেশী বাস করে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায়।

সাঁওতালদের আদিবাসস্থান যেখানেই হউক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে তাদের বর্তমান অবস্থান দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে তারা মূলতঃ রাঢ়দেশের বা

ভাগীরথীর পশ্চিমভাগস্থ অঞ্চলের লোক। কেন না পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের মোট সংখ্যার (১২,০০,০১৯) ৭৫·৭৩ শতাংশ বাস করে মেদিনীপুর (২,৩৩,৭৯৮), পুরুলিয়া (১,৭৬,৮৯৯), বর্ধমান (১,৫৪,৬৫৭), বাঁকুড়া (১,৫২,২৫৪), বীরভূম (৯৩.৪২৬) ও হুগলী (৭৩,৭৮১) জেলায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাস করে পশ্চিমদিনাজপুর (১,২২,১৯২), মালদহ (৮৪,২০৭), ও জলপাইগুড়ি (৩৮,৫৬০) জেলায়। অন্তর্বর্তী জেলাসমূহে তাদের বসবাস খুবই কম। বস্তুতঃ তাদের বর্তমান অবস্থান দেখলে মনে হয় যে, তারা প্রথমে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও পুরুলিয়া অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, এবং সেখান থেকে তারা নিজেদের চতুর্দিকে বিস্তৃত করেছিল। চব্বিশ পরগণায় তাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ৩১,৬১৪। মনে হয় কোন এক সময় তাদের এক অংশ ভাগীরথী অতিক্রম করে চব্বিশ পরগণায় এসে বসবাস শুরু করেছিল, আর অপর এক অংশ নিজেদের উত্তর বাঙলায় বিস্তৃত করেছিল। তবে কবে এবং কি কারণে, এবং কিসের চাপে তারা নিজেদের রাঢ়দেশের আদি বাসভূমি পরিহার করে অন্য অঞ্চলসমূহে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল, তা আমাদের জানা নেই। তবে সাঁওতালদের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে জাগে। সাঁওতালরা নিজেদের উৎপত্তি হাঁস থেকে নিরূপিত করে। তার মানে, হাঁসই তাদের টটেম ছিল। হাঁস পক্ষী-বিশেষ। বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের লোকদের পক্ষী-বিশেষ বলে বর্ণনা করেছে। তারা কি সাঁওতাল বা অনুরূপ কোন জাতি?

তবে এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, কোন এক সময় দক্ষিণ-বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল (এক সময় এ অঞ্চল বাঙলাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল) থেকে কোন কারণবশতঃ ওরাঁও ও মুণ্ডারা নিজেদের বিস্তারিত করেছিল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চলসমূহে, এবং তাদেরই অনুগমনে সাঁওতালরা কেন্দ্রাভিগ হয়ে পড়েছিল। সে কারণটা রাজনৈতিক চঞ্চলতা, না দুর্ভিক্ষ, না হিন্দুদের অত্যাচার, না নীলচাষের জন্য শ্রম নিয়োগ, তা বলা কঠিন। বর্তমান যুগে চা-বাগানে উপজাতীয় শ্রম নিয়োগও এর কারণ হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সাঁওতালদের সঙ্গে মুণ্ডাদেরই ভাষাগত ঐক্য আছে, ওরাঁওদের সঙ্গে নেই। মুণ্ডারা অধিক সংখ্যায় বাস করে জলপাইগুড়ি (৫৩,৮৮১) ও চব্বিশ পরগণা (৪২,২৫৬) জেলায়। এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গের মোট মুণ্ডা

জনসংখ্যার (১,৬০,২৪৫) ৬০·১৮ শতাংশ এই দুই জেলায় অবস্থিত। তারা যে এই দুই জেলায় আগন্তুক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এদের মধ্যে কত সংখ্যক চিরস্থায়ী বাসিন্দা এবং কত সংখ্যক ভাসমান শ্রমিক জনমণ্ডলী, তা বলা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাসমূহে মুণ্ডাদের সংখ্যা হচ্ছে ৬৪,১০৮ বা মোট মুণ্ডা জনসংখ্যার মাত্র ৩৯·০২ শতাংশ। ওরাঁওদের বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় জলপাইগুড়ি (১,৮১,৫২৯), দার্জিলিং (২৮,৩৮৮), পশ্চিমদিনাজপুর (২২,২৮৭) ও চব্বিশপরগণায় (২৪,০০৭)। এই চার জেলায় ওরাঁওদের সংখ্যা হচ্ছে ২,৬৪,৮০১, তার মানে পশ্চিমবঙ্গের মোট ওরাঁও জনসংখ্যার (২,৯৭,৩৯৪) ৮৯·০৪ শতাংশ।

সাঁওতালরাই যে পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসী ও আদি-অস্ত্রাল জাতিভুক্ত, আর বাকি অন্যান্য উপজাতিরা এখানে আগন্তুক মাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংখ্যা-গরিমার দিক থেকে প্রথম ছয়টি উপজাতির জনসংখ্যার নিচে যে তালিকা দেওয়া হল, তা থেকে এটা স্বতই প্রমাণিত হয়—

উপজাতি	পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতাংশ
১. সাঁওতাল	১২,০০,০১৯	৫৮·৪২
২. ওঁরাও	২,৯৭,৩৯৪	১৪·৪৮
৩. মুণ্ডা	১,৬০,২৪৫	৭·৮০
৪. ভূমিজ	৯১,২০৯	৪·৪৪
৫. কোরা	৬২,০২৯	৩·০২
৬. খেরিয়া বা লোধা	৪০,৮৯৮	১·৯৯
৭. বাকি ৩৫টি উপজাতি	২,০২,২০৭	৯·৮৫
মোট উপজাতি জনসংখ্যা	২০,৫৪,০৮১	১০০·০০

দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলার উপজাতিসমূহের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ২০,৫৪,০৮১। আর তার মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা ভূমিজ, কোরা ও লোধাদের সমষ্টিগত সংখ্যা হচ্ছে ১৮,৫১,৮৭৪। সুতরাং এই ছয়টি উপজাতির জনসংখ্যা হচ্ছে, বাঙলার উপজাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার ৯০·১৫ শতাংশ। বাকি ৩৫টি উপজাতির সংখ্যা হচ্ছে ২,০২,২০৭ বা মোট উপজাতি জনসংখ্যার ৯·৮৫ শতাংশ।

সংখ্যা-প্রধান প্রথম ছয়টি উপজাতির মধ্যে সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। ওঁরাওদের অবস্থান হচ্ছে জলপাইগুড়ি (৬১.১ শতাংশ), দার্জিলিং (২.৫ শতাংশ) ও চব্বিশপরগণা (৮.৩ শতাংশ) জেলায়। অন্যান্য জেলাসমূহে ওঁরাও উপজাতি সমষ্টিগতভাবে মাত্র ২১.১ শতাংশ বাস করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুণ্ডাদের মত ওঁরাওরা ভাগীরথীর পূর্ব অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত।

ভূমিজরা কিন্তু রাঢ় দেশের বা ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলের লোক। এদের বাসস্থান প্রধানত, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর চব্বিশপরগণা ও পুরুলিয়া জেলায়।

যদিও জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু সংখ্যক কোরার সাক্ষাৎ মেলে, তা হলেও কোরাদের অবস্থিতি মোটামুটি ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও হুগলি জেলায়। লোধাদেরও বাসস্থান হচ্ছে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে—মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়। কিন্তু তাদের কেন্দ্রীভূত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় সংলগ্ন ওড়িষার ময়ূরভঞ্জ জেলায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাকি ৩৪টি উপজাতির জনসংখ্যা হচ্ছে নগণ্য। তাদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে—১. আদি-অস্ত্রাল ও ২. মঙ্গোলীয়। প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বেদিয়া, বিরহর, চেরো, গোণ্ড, গোরাইত, হো, করমালী, খারওয়ার, কোরওয়া, লোহারা, মহালী, মালপাহাড়িয়া, নাগেসিয়া, পারহাইয়া, সওরিয়া, পাহাড়িয়া ও শবর। আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজাঙ, লেপ্‌চা, মগ, মেচ, মুরু ও রভা। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বাসস্থান হচ্ছে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত-অঞ্চলে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মঙ্গোল জাতিসমূহের মাথা সাধারণতঃ গোল। কিন্তু আসাম ও ভারত-ব্রহ্মসীমান্তের উপজাতি-সমূহের মাথা গোল নয়। তাদের মধ্যে লম্বা ও মাঝারী উভয় রকম মাথারই প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া অন্যান্য দীর্ঘ-শির বা দীর্ঘ-কপাল জাতি সমূহের ন্যায় তাদের ঘাড়ের উপর মাথার খুলির অংশ (occiput) পিছন দিকে বেশী বের করা। ঘন ও ঈষৎ পিঙ্গল এবং এই দুই রঙের মাঝামাঝি সবরকম গায়ের রঙই এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের জ্র অনুচ্চ, মুখের পরিধি ছোট ও চিবুকের হাড় বেশ উঁচু। এদের

নাকের গড়ন মাঝারি, এবং তা খাঁটি 'মঙ্গোল' নাকের মত চ্যাপটা। এদের মুখে ও গায়ে অল্প লোম, ও চোখের খোল বাঁকা। দৈর্ঘ্যে এরা মাঝারি।

যদিও আদি-অস্ত্রাল ও মঙ্গোলীয় উপজাতিসমূহ দুই ভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক, তথাপি তাদের মধ্যে ভাষার ঐক্য আছে। উভয়েই অষ্ট্রিক ভাষায় কথা বলে। অষ্ট্রিক ভাষাভাষীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—১. মুণ্ডারী ও ২. মোন্-খ্‌মের। ভারতের উপজাতিসমূহ, যথা—সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি মুণ্ডারী ভাষায় কথা বলে। আর আসাম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতিরা মোন্-খ্‌মের গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলে।

আদি-অস্ত্রাল ও মঙ্গোলীয় জাতিদ্বয়ের মধ্যে ভাষার ঐক্য থাকলেও, তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজের গঠন, ও অন্যান্য রীতিনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন, আসামের খাসিয়া সমাজে গৃহকর্ত্রীর মেয়েরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় ও গৃহকর্ত্রীর নাম ও গোত্র পায়। বাঙলার সাঁওতালসমাজে কিন্তু পুরুষেরাই সম্পত্তির মালিক হয় ও পুত্র-পৌত্রাদি পিতামহের গোত্র বা কুল-নাম পায়। এ ছাড়া, আগেই বলা হয়েছে যে দৈহিক আকার ও লক্ষণের দিক থেকেও সাঁওতালদের সঙ্গে মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের কোন মিল নেই।

ভৌগোলিক পরিবেশের দিক থেকে উপজাতিসমূহের লোক সবচেয়ে বেশী বাস করে জলপাইগুড়ি জেলায় (৩,৫৭,৭৭১)। তারপর জনসংখ্যার ক্রম-হ্রাসমানতা অনুযায়ী, তারা বাস করে মেদিনীপুর (৩,২৯,৭৩৬), পুরুলিয়া (২,৬২,৮৫৮), বর্ধমান (১,৮০,১৪৩) বাঁকুড়া (১,৭৩,৩০৯), পশ্চিম দিনাজপুর (১,৭০,১৭৯), চব্বিশ পরগণা (১,১৯,৩১৮), বীরভূম (১,০৬,৮৬০), মালদহ (৯৯,৫২২), দার্জিলিং (৯৬,৪৪৪), হুগলী (৯০,১০৬), মুর্শিদাবাদ (৫১,৪৫২), নদীয়া (২১,৯২৩), কুচবিহার (৩,৮০৯), হাওড়া (৬,১১১) জেলাসমূহে। কলিকাতা অঞ্চলেও কিছুসংখ্যক উপজাতি গোষ্ঠীর লোক আছে। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২,৫২০।

তিন

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬৩টি তপশীলভুক্ত জাতি আছে। তাদের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৬৮,৯০,৩১৪। ক্রম-হ্রাসমান সংখ্যা-গরিমার দিক থেকে তাদের মধ্যে যারা প্রধান, তারা হচ্ছে রাজবংশী (১২,০১,৭১৭), বাগদী (১০,৯৩,৮৮৫), পোদ (৮,৭৫,৫২৫), নমশূদ্র (৭,২৯,০৫৭), বাউরী (৫,০১,২৬৯), চামার বা মুচী (৩,৯৬,৫৯১), ধোবা (১,৫৪,৭৯১), ডোম (১,৫১,৮১৮), হাড়ী (১,২৫,৮৫০), কেওড়া (১,১৭,২২৯), জেলে-কৈবর্ত (১,১৭,৩৮৪), মাল (১,১৭,০০৪), শুঁড়ি (১,০৬,৮৭০), লোহার (৮৩,৫৪৫), পলিয়া (৭৩,৯৯৭), ঝালোমালো (৬৮,৭৫৭), থয়রা (৬৭,৯১৩), ও ভূঁইয়া (৫৩,৩২৯)। তপশীলভুক্ত জাতি-সমূহের মোট জনসংখ্যা (৬৮,৯০,৩১৪), এরা হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে ৮৭·৬৭ শতাংশ। বাকী ৪৫টি তপশীলভুক্ত জাতির প্রত্যেকটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৫০,০০০ এর কম। আবার অনেক তপশীলভুক্ত জাতির জনসংখ্যা হচ্ছে এক হাজারেরও কম। যা হোক, সমষ্টিগতভাবে এদের জনসংখ্যার অনুপাত হচ্ছে মোট তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২.৩২ শতাংশ।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তপশীলভুক্ত জাতির জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশী তপশীলভুক্ত জনসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় চব্বিশ পরগণায় (১৫,২৪,৯২২)। এর পর ক্রম-হ্রাসমান অবস্থায় স্থান পায়, বর্ধমান (৭,৫৩,৮৮৩), মেদিনীপুর (৫,৬৩,৭০৬), ও বাঁকুড়া (৪,৯২,৭০০)। কুচবিহার, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া—এই পাঁচটি জেলায় তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ বাস করে। আর পুরুলিয়া, মালদহ, কলিকাতা ও দার্জিলিং এই চারটি জেলায় বাস করে মাত্র ৮ শতাংশ তপশীলভুক্ত জাতির লোক। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশী তপশীলভুক্ত লোকসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহারে (৪৬·৯০ শতাংশ)। এরপর স্থান পায় জলপাইগুড়ি (৩০·৮০ শতাংশ), বাঁকুড়া (২৯·৬০ শতাংশ), বীরভূম (২৯·১৪ শতাংশ), বর্ধমান (২৪·৪৫ শতাংশ) ও চব্বিশ পরগণা (২৪·২৮ শতাংশ)।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের উৎপত্তি হয়েছে উপজাতিসমূহ হতে। মাত্র হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর থেকেই, তারা বর্ণ ও

জাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছে। রাজবংশীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাদের উৎপত্তি হয়েছে কোচ-উপজাতি থেকে। রীজলি বলেছিলেন যে, রাজবংশী কোচ ও পলিয়াদের উৎপত্তি একই উৎস থেকে হয়েছে। রাজ-বংশীদের প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহার, পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশ পরগণায়। পোদেরা এখন নিজেদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। মনে হয়, প্রাচীন সাহিত্যে উক্ত পুণ্ড্র জাতি হতে তারা অভিন্ন। পোদেদের আবাসস্থল প্রধানতঃ মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা। বাগদীরাও এখন নিজেদের ব্যগ্রক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। ওল্ডহামের মত অনুযায়ী তারা মাল-জাতিরই এক উপশাখা মাত্র। তবে বাগদীরা যে ভাবে নিজেদের গোষ্ঠী-বিভাগ করে (যেমন তেঁতুলিয়া, দুলিয়া, মাটিয়া) তা থেকে মনে হয় যে, এগুলি এক সময় উপজাতি-সংক্রান্ত 'টটেম' ছিল। উত্তরবঙ্গ ছাড়া বাগদীদের পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। সেন বংশীয় রাজা বল্লালসেনের রাজ্যের এক অংশের (দক্ষিণবঙ্গের) নাম ছিল বাগড়ি। মনে হয়, এটা বাগদী-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। নমশূদ্রদের বাস হচ্ছে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা ও কুচবিহার জেলায়। রীজলির মত অনুযায়ী পোদ, কয়াল কোটাল, গুলিয়া, ও বেরুয়া—এরা সকলেই হচ্ছে নমশূদ্র-গোষ্ঠির উপশাখা। অনেকে নমশূদ্র ও চণ্ডাল সমার্থবোধক শব্দ বলে মনে করেন, কিন্তু নমশূদ্ররা নিজেদের চণ্ডাল থেকে উচ্চ সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করে। বাউড়ীরা প্রধানতঃ রাঢ়দেশের লোক। তাদের বর্তমান আবাসস্থল হচ্ছে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও পুরুলিয়া জেলায়। তাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ৫,০১,২৫৯ বা সমগ্র তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জনসংখ্যার ৭·২৭ শতাংশ। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তারা দাবী করে যে, দেবগণের খাদ্য অপহরণ করার অপরাধে তাদের বাউরী জাতি হিসাবে জন্মাতে হয়েছে। বস্তুতঃ দেশজ উপজাতিসমূহ যখন হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুসমাজে অনুপ্রবেশ করে, তখন তারা সকলেই এক একটা উপকথা সৃষ্টি করে নিজেদের গৌরবান্বিত করবার চেষ্টা করে। যেমন, চামাররা নিজেদের রামানন্দের শিষ্য রবিদাস বা রুইদাস এর বংশধর বলে দাবী করে। মুচিরা নিজেদের ঋষি বলে আখ্যাত করে। অনুরূপভাবে ধোবারা নিজেদের নেতামুনি বা নেতা-ধোপানীর বংশধর বলে দাবী করে। কিন্তু জন

পুরাণ ও অন্যান্য কয়েকটি পুরাণ অনুযায়ী ধোবারা ধীবর পিতার ঔরসে তীবর মাতার গর্ভে উৎপন্ন হয়। অবশ্য অনুরূপ উৎপত্তি-কাহিনী ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ-সমূহে মাত্র ধোবাদের সম্বন্ধেই লেখা নেই, অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও লেখা আছে। আমরা তা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। অনুরূপভাবে হাড়িরা দাবী করে যে, তারা ব্রহ্মার হাতের ময়লা হতে উৎপন্ন হয়েছে। তবে বর্তমান জাতিবিন্যাস ব্যবস্থিত হবার পূর্বে, এই সকল 'অন্ত্যজ' জাতির সমাজে যে অনুরূপ স্থান ছিল, তা মধ্যযুগের চণ্ডীগানসমূহে ডোম জাতির ভূমিকা থেকে বুঝতে পারা যায়।

রাজবংশী, বাগ্‌দী, পোদ, নমশূদ্র, বাউরী, চামার, ধোবা, ডোম ও হাড়ি ছাড়া আর যে প্রধান প্রধান তফশীলভুক্ত জাতি আছে, তারা হচ্ছে কেওড়া (১,১৭,৯২৯), কেওট (২৩,১৭৪), জেলে-কৈবর্ত (১,১৭,৩৮৪), মাল (৬৮,৭৫৯), শুঁড়ি (১,০৬,০৭০), লোহার (৮৩,৫৪৫), পলিয়া (৭৩,৯৯৭), ঝালোমালো (৬৮,৭৫৭), খয়রা (৬৭,৯১৩), ভুঁইয়া (৫৩,৩২৯), কোনাই (৪১,১০১), ও ভুঁইমালী (৩৯,১৮১)। [বন্ধনীর মধ্যে এদের জনসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে]।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন-আইন অনুযায়ী এদের সকলকেই তফশীলভুক্ত জাতি বলে অভিহিত করা হয়। তার পূর্বে হিন্দু সমাজের জাতিবিন্যাসে এদের এক নির্দিষ্ট স্থান ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে আমরা তার একটা আভাস পাই। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুযায়ী রজক (ধোবা), ধীবর (জেলে-কৈবর্ত), শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) প্রভৃতি জাতি হচ্ছে মধ্যম সঙ্কর জাতি, আর চণ্ডাল, চর্মকার (চামার বা মুচি), ডোলাবাহী (বাগদী), মল্ল (মাল), প্রভৃতি জাতি হচ্ছে 'অন্ত্যজ' জাতি

চেহারার সাদৃশ্য থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, তফশীলভুক্ত জাতিসমূহ উপজাতিসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কোচ ও রাজবংশীদের কিছু অংশ মঙ্গোলীয় উপজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু বাকি উপজাতিসমূহ আদি-অস্ত্রাল নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই আদি-অস্ত্রাল উপজাতিসমূহ যে বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠনেই সাহায্য করেছে তা নয়, তারা উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি, ও সংস্কার রচনাতেও যথেষ্ট উপাদান জুগিয়েছে। এদের ভাষার শব্দসমূহ যে বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই। তা ছাড়া, কুলকেতুর (টটেম) পূজা-সংক্রান্ত আচার-ব্যবহার, শুভকাজে তেল হলুদের ব্যবহার, ঝাড়-ফুঁক, খাদ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার বিধি-নিষেধ, যাদুতে বিশ্বাস, পংক্তি ভোজন, সগোত্র-বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ, বর্ণভেদ প্রথার মূল কথা, ধান্যের চাষ, হস্তিবিদ্যা প্রভৃতি আদি-অস্ত্রাল উপজাতিসমূহের নিকট হতে বাঙালী সমাজে গৃহীত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙলার জাতিবিন্যাস ও নৃতাত্ত্বিক জাতিতত্ত্ব

আগের অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যে, উপজাতি ও তফশীলভুক্ত জাতিসমূহ পশ্চিমবঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যার ৩২'৪৯ শতাংশ। এরাই হচ্ছে বাঙলার আদিম অধিবাসী, এবং এরাই রচনা করেছে বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ। পশ্চিমবঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যার বাকী ৬৭'৫১ শতাংশ তফশীল-বহির্ভূত জাতিসমূহ। মোটামুটিভাবে আমরা তাদের বাঙলার উচ্চজাতি বলে বর্ণনা করি।

বাঙলার উচ্চজাতিসমূহ প্রায় সকলেই বিস্তৃত-শিরস্কতার ছাপ বহন করছে। এই বিস্তৃত-শিরস্কতার বিস্তৃতি কিছু পরিমাণে উপজাতি ও তফশীলভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যেও ঘটেছে। বাঙলার উচ্চজাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্কতার লক্ষণ দেখে রীজলি কিরূপ ভ্রমে পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, বাঙালী তার বিস্তৃত-শিরস্কতা আলপীয় নরগোষ্ঠী থেকে পেয়েছে। মনে হয় এই আলপীয় গোষ্ঠীর লোকেরা সমুদ্রপথে এশিয়া-মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম উপসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে, ক্রমশঃ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কূর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌছায়। তাদেরই একটা বড় দল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলায় ও ওড়িষায় এসে বসবাস শুরু করেছিল। এরাই উচ্চশ্রেণীর বাঙালীদের পূর্বপুরুষ। তবে এরাও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি। এদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল কিছু পরিমাণে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেদের সঙ্গে।

যদিও আলপীয়রা আর্য-ভাষাভাষী ছিল, তবুও তাদের ভাষার সঙ্গে পঞ্চনদের উপত্যকায় আগত 'নর্ডিক' পর্যায়ভুক্ত বৈদিক আর্যদের ভাষার কিছু পার্থক্য ছিল। গ্রিয়ার্সন এই পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাঙলাদেশের আর্য-ভাষাভাষী লোকেরা 'অসুর' জাতিভুক্ত। এটা মহাভারতের এক উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মদেশের লোকেরা দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে,

মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অসুর-রাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তান। মনে হয় এই উক্তির পিছনে আছে দীর্ঘতর কোন জাতির সহিত রক্ত সংমিশ্রণের কাহিনী।

এখন কথা হচ্ছে, এই অসুর জাতির লোকেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকেই বা বাঙলাদেশে এসেছিল? বৈদিক ও বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দটির খুব ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় দেবগণের বিরোধী হিসাবে। ঋগ্বেদে শব্দটির বহু উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডলের যে সকল সূক্ত ও ঋকে 'অসুর' শব্দটির উল্লেখ আছে সেগুলি যথাক্রমে ১।২৪।১৪, ১।৫৪।৩, ২।১।৬, ৩।৩।৪, ৪।২।৫, ৫।১২।১, ৬।২২।২, ৭।২।৩, ৭।৬।২, ৭।১৩।১, ৭।৩০।৩, ৭।৩৬।২, ৭।৫৬।২৪, ৭।৬৫।২৪, ৭।৬৫।২, ৭।৯৯।৫, ৮।৯।২৩, ৯।৭৩।১, ও ১০।১০।২। পিপ্রুর অসুর-রাজ ও অন্যান্য অসুর-রাজগণের উল্লেখও ঋগ্বেদে আছে। আমরা অনুমান করেছি যে, অসুররা বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি ছিল। প্রথম অধ্যায়ে আমরা প্রাচীন নরকঙ্কাল সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, তা থেকেও জানতে পারি যে, হরপ্পা যুগে গুজরাট ও সিন্ধুপ্রদেশে বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি বিদ্যমান ছিল। ভারতের মেগালিথ নির্মাণকারীরাও বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি ছিল। মেগালিথের অনুরূপ প্রোথিত শিলাখণ্ড বাঙলার মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া গিয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে 'অসুর' বলতে আর্যপূর্ব-যুগের ভারতের এক দেশজ জাতি বুঝাত। যদি অসুররা বৈদিক আর্যগণের আগমনের পূর্বেই ভারতে এসে থাকে, তা হলে তারা যে দেশজ এই মতামত গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই। বৈদিক সাহিত্যে আমরা 'দাস', 'দস্যু', 'নিষাদ' প্রভৃতি আরও অনেক দেশজ জাতির নাম পাই। সুতরাং বৈদিক আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বে এদেশে যে একাধিক জাতি বাস করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের অনেককেই অনার্য-ভাষাভাষী বলা হয়েছে। কিন্তু সকলেই যে অনার্য-ভাষাভাষী ছিল, তার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। বরং বৈদিক আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বে আগত আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা যে আর্য-ভাষাভাষী ছিল, তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যদি বৈদিক আর্য ও অসুররা উভয়েই আর্য-ভাষাভাষী হয়, তা হলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে ভারতে আগমনের পূর্বে উভয়েই একই সাধারণ বাসস্থানে বাস করত। এই স্থানে বাসকালে অসুরদের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের জীবনচর্যা ও ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এই জীবনচর্যা ও

ধর্ম বৈদিক আর্যগণের জীবনচর্যা ও ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। বৈদিক আর্যগণ ভারতে আগমনের পূর্বে অনেকগুলি নূতন দেবতার আরাধনার পত্তন করেছিল। এই নূতন দেবতাগণকে তারা 'দেইবো' (প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয়), বা 'দইব' (ইন্দো-ইরানীয়) বা দেব (সংস্কৃত) নামে অভিহিত করত। আর আর্য-ভাষাভাষী অপর গোষ্ঠী তাদের আরাধ্যমগুলীকে 'অসুর' নামে অভিহিত করত। এই পরম্পরা থাকার দরুন প্রাচীন পারসীকরা ও বৈদিক আর্যগণও তাদের অনেক দেবতাকে কখন কখনও 'অসুর' নামে অভিহিত করত। বস্তুতঃ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে অসুরগণের যেমন নিন্দাবাদ ও কটাক্ষ করা হয়েছে, তেমনই আবার দেব-উপাসকগণের প্রধান আরাধ্য দেবতা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণকে 'অসুর' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দেব-উপাসকগণ ও অসুর-উপাসকগণ উভয়েই কোন সময় এক সাধারণ অঞ্চলে বাস করত। উত্তরকালে এই অসুরপন্থীরা এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভারতে বসতি স্থাপন করে। এরাই যে উচ্চবর্ণ বাঙালীর পূর্বপুরুষ সে কথা আগেই বলা হয়েছে। (লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', প্রকাশক : জিজ্ঞাসা, দ্রষ্টব্য)।

দুই

তবে আগেই বলা হয়েছে যে বাঙলায় আগত আলপীয়রা তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি। তারা বাঙলার আদি-অস্ত্রাল ও তাদের পূর্বে আগত দ্রাবিড়-ভাষাভাষীদের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে খানিকটা সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ এই সকল নৃতাত্ত্বিক উপাদান আছে, সে সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা বাঙলার আদি ও পরবর্তী কালের সমাজবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলে নিতে চাই। বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুপ্রবেশ অনেক পরে ঘটেছিল। আদিতে বাঙলার সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক ছিল। এই সকল কৌমজাতির অন্যতম ছিল পুণ্ড্র ও কর্বট। মনে হয় পুণ্ড্রদের বংশধর হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি, ও কর্বটদের বংশধর হচ্ছে কৈবর্ত। এছাড়া, প্রাচীন বাঙলায় আরও কৌমভিত্তিক

জাতি ছিল, যথা বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, বাউরী ইত্যাদি। বাগ্দীরাই যে একসময় বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল, তা আমরা প্রাচীন গ্রীস দেশীয় লেখকদের রচনাবলী থেকে জানতে পারি। এরা ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বক্রু' জাতির বংশধর কি না তাও বিবেচ্য।

যদিও খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তথাপি গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাঙলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি। কিন্তু গুপ্তযুগের পরে পালরাজগণের সময় বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বাঙলাদেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সে যুগে জাতিভেদের যে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। পাল-রাজগণের পরে সেনরাজগণ বাঙলায় আবার ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নূতন করে আবার একটা জাতি-বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু পালরাজগণের চার শত বৎসরের রাজত্বকালে সবই একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বহু সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ (যা সেনরাজগণের রাজত্বকালের অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছিল) থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলায় আর সব জাতিই সঙ্কর জাতি। তবে এই সকল সঙ্কর জাতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল—১. উত্তম সঙ্কর, ২. মধ্যম সঙ্কর, ও ৩. অন্ত্যজ। সে যাই হোক, বাঙলার জাতিসমূহ যে সঙ্কর জাতি তা বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাঙলার জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক-পরিমাপ থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তবে এই সংমিশ্রণ যে কার সঙ্গে কার ঘটেছিল, তার প্রকৃত হদিশ পাওয়া যায় না, কেন না বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে এদের বিভিন্ন রকম উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। কোথাও বা কোন জাতি অনুলোম-বিবাহের ফসল, আবার কোথাও বা তারা প্রতিলোম-বিবাহের ফসল। এটা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে—

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র*
১. অম্বষ্ঠ	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫, ৭, ১, ১২
	২. ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪

*১. বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ২. বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ৩. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ৪. গৌতম ধর্মসূত্র, ৫. মনুসংহিতা, ৬. মহাভারত, ৭. পরাশর, ৮. সূত সংহিতা, ৯. উশনস সংহিতা, ১০. বিষ্ণু ধর্মসূত্র, ১১. বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র, ১২. যাজ্ঞবল্ক্য, ১৩. জাতিমালা।

	জাতি		পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
২.	আগুরি		করণ	রাজপুত্র	৮
৩.	উগ্র	১.	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	১, ৫, ১২, ৬
		২.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৯
		৩.	বৈশ্য	শূদ্র	৪
৪.	কর্মকার	১.	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
		২.	শূদ্র	বৈশ্য	২
		৩.	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
৫.	করণ		ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৬
৬.	চর্মকার	১.	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	৯
		২.	বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৯
		৩.	বৈদেহক	নিষাদ	৬
		৪.	অয়োগব	ব্রাহ্মণ	৮
		৫.	তিবর	চণ্ডাল	৩
		৬.	তক্ষণ	বৈশ্য	২
৭.	তিলি		গোপ	বৈশ্য	২
৮.	তেলি		বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
৯.	তামলি		বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
১০.	কংসবণিক		ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
১১.	চণ্ডাল		শূদ্র	ব্রাহ্মণ	৬
১২.	নাপিত	১.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
		২.	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
		৩.	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
		৪.	ক্ষত্রিয়	নিষাদ	৮
১৩.	বাগ্দী		ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৩
১৪.	হাড়ি		লেট	চণ্ডাল	৩
১৫.	সুবর্ণবণিক	১.	অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	২
		২.	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩

	জাতি		পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
১৬.	গন্ধবণিক	১.	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
		২.	অম্বষ্ঠ	রাজপুত্র	৭
১৭.	কায়স্থ		ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
১৮.	কৈবর্ত	১.	নিষাদ	অয়োগব	৫
		২.	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
		৩.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
		৪.	নিষাদ	মগধ	৬
১৯.	গোপ	১.	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	২
		২.	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৭
২০.	ডোম		লেট	চণ্ডাল	৩
২১.	তন্তুবায়	১.	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	১
		২.	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
২২.	ধীবর	১.	গোপ	শূদ্র	২
		২.	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	৫
২৩.	নিষাদ	১.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	কৌটিল্য
		২.	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৬
		৩.	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৩
২৪.	পোদ	১.	বৈশ্য	শূদ্র	৩
২৫.	মালাকার	১.	বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
		২.	ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	২
২৬.	মাহিষ্য		ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪, ১২
২৭.	মোদক		ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
২৮.	রজক	১.	বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৮
		২.	ধীবর	তিবর	৩
		৩.	করণ	বৈশ্য	২
২৯.	বারুজীবী	১.	ব্রাহ্মণ	শূদ্র	২
		২.	গোপ	তন্তুবায়	১৩

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
৩০. বৈদ্য	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫
	২. শূদ্র	বৈশ্য	৬
৩১. শুঁড়ি	১. বৈশ্য	তিবর	৩
	২. গোপ	শূদ্র	২

পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত জাতিসমূহের উৎপত্তি-কাহিনী যে একেবারে কল্পনা প্রসূত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন না, প্রথমতঃ পরস্পর-বিরোধী মতবাদ, ও দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ভারতের বর্ণবাচক জাতি হিসাবে 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য' জাতি কোনদিনই বাঙলায় ছিল না। গুপ্তযুগের বহু লিপিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বহু লোকের উল্লেখ আছে, কিন্তু ওই সকল লিপিতে কেহ নিজেকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবী করেন নি। তবে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাঙলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানাজাতির রক্তের মিশ্রণের ফসল তা নয়, পুনর্মিশ্রণেরও ফল।

পরবর্তী কালে বাঙলায় যে সমাজবিন্যাস রচিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১. ব্রাহ্মণ, ২. বৈদ্য, ৩. কায়স্থ, ৪. নবশাখ, ৫. অন্যান্য জাতি। নবশাখ হচ্ছে, যে-সকল জাতির হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তিলি, তাঁতী, মালাকার, সদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, ও মোদক। অন্যান্য জাতিসমূহ ছিল জল-অনাচরণীয়। সুবর্ণবণিকদের জল-আচরণীয় জাতির তালিকা থেকে বাদ দেবার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, বল্লভানন্দ নামে প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক রাজা বল্লাল সেনকে অর্থ সরবরাহ করতে অসম্মত হওয়ায় বল্লাল সেন তাদের অবনমিত করেন।

তিন

এবার আমরা বাঙলার জাতি, উপজাতি ও তফশীলভুক্ত জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথমেই এদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেওয়া যাক।

জাতি	শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
*ব্রাহ্মণ	৭৮.৮	৭০.৮	১৬৭৬
*কায়স্থ	৭৮.৪	৭০.৭	১৬২৬
সদ্গোপ	৭৮.৬	৭৪.২	১৬৩৩
গোয়ালা	৭৭.৩	৭৬.৬	১৬৫৬
কৈবর্ত	৭৭.৫	৭৬.৯	১৬২৯
পোদ	৭৭.৮	৭৬.৪	১৬২৫
রাজবংশী	৭৫.৬	৭৫.৯	১৬০৭
বাগদী	৭৬.৪	৮০.৮	১৬০৩
বাউরী	৭৫.১	৮৫.৩	১৫৮৫
চণ্ডাল	৭৮.১	৭৪.২	১৬১২
মুসলমান	৭৭.৯	৭৭.৫	১৬২৪
সাঁওতাল	৭৬.১	৮৮.৮	১৬১৪
মুণ্ডা	৭৬.৫	৮৯.৯	১৫৮৯
ওরাঁও	৭৫.৪	৮৪.১	১৬২১
মালপাহাড়িয়া	৭৪.৮	৯৩.৬	১৫৭৭

আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হবে যে, এরা কেউই বিস্তৃত-শিরস্ক নয়, সবাই নাতি-দীর্ঘ শিরস্ক বা মাঝারি আকারের মাথার লোক। আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙলায় আসবার পর আল্পীয়রা বাঙলার দেশজ জাতিসমূহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। দেশজ জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ক নরগোষ্ঠীর লোক ছিল। সুতরাং এই সংমিশ্রণের প্রতিক্রিয়া গড়-পরিমাপের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত যে সকল ব্যক্তির পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার বিস্তৃতির (range) দিকে নজর দিলে আমরা অন্য দৃশ্য দেখতে পাব। যেমন, যদিও ব্রাহ্মণদের গড় শিরাকার-জ্ঞাপক-সংখ্যা ৭৮.৮, তথাপি যে

*ড. বিরজাশঙ্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে —

ব্রাহ্মণ	৭৬.৯	৬৭.৭	১৬০০
কায়স্থ	৮০.৮	৬৮.৯	১৬১০

সকল ব্রাহ্মণের পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার বিস্তৃতি হচ্ছে ৭২ থেকে ৮৭। অনুরূপভাবে কায়স্থদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার বিস্তৃতি হচ্ছে ৭০ থেকে ৮৮, এবং সদ্গোপদের ঠিক ব্রাহ্মণদের মত ৭২ থেকে ৮৭। লক্ষ্য করা যাবে যে, যদিও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের শিরাকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার গড় প্রায় একই, এবং বিস্তৃতির দিক থেকে যদিও ব্রাহ্মণ ও সদ্গোপদের বিস্তৃতি এক, তথাপি এদের গড়ের মধ্যে মিল নেই। গড়ের পার্থক্য নির্ভর করেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্ক ব্যক্তির অনুপাতের কম বেশীর উপর। বস্তুতঃ উপরে যে সকল জাতি ও উপজাতির পরিমাপ দেওয়া হয়েছে, তাদের সকলেরই মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্কতা (তার মানে ৮০র উপর শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা) বর্তমান আছে। গড় যত নীচের দিকে গিয়েছে, সেই জাতির মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্ক ব্যক্তির সংখ্যা তত কম। সেটা ঊর্ধ্বতম বিস্তৃত-শিরস্কের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা থেকেও প্রকাশ পায়। যথা, কৈবর্তদের মধ্যে ৮৭, পোদেদের ৮৫, চণ্ডালদের ৮৯, বাগ্দীদের ৮৩, বাউরীদের ৮১, ভূমিজদের ৮৪, সাঁওতালদের ৮৮, মুণ্ডাদের ৮১, ও ওঁরাওদের ৮৭। অনুরূপভাবে সবচেয়ে নিম্নতম দীর্ঘশিরস্ক ব্যক্তিদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ও তাদের সংখ্যা-পরিমাণ গড়কে প্রভাবান্বিত করেছে। যথা ব্রাহ্মণদের ৭২, সদ্গোপদের ৭২, বাউরীদের ৭১, কায়স্থ, কৈবর্ত, পোদ ও চণ্ডালদের ৭০, বাগদীদের ৬৮, ভূমিজদের ৬০, সাঁওতালদের ও মুণ্ডাদের ৬৯ ও ওরাঁওদের ৬৭। বস্তুতঃ বাঙলাদেশে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের সংমিশ্রণ এমনভাবে ঘটেছে যে, পরবর্তী কালে পুরাণকারগণ বাঙলার জাতিসমূহকে 'সঙ্কর' জাতি বলে অভিহিত করে অন্যায় কিছু করেন নি।

তবে একথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, মাত্র শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যার উপর নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব নিরূপণ করা যায় না। এর সঙ্গে নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ও দেহ-দৈর্ঘ্যের পরিমাপও বিচার করতে হয়। সেদিক থেকে দেখা যাবে যে, আমরা উপরে প্রদর্শিত জাতিসমূহের যে তালিকা দিয়েছি তাতে আমরা যত উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীর দিকে যাব, তত বেশী চওড়া নাক ও খাট দেহ-দৈর্ঘ্য (উভয়ই আদি-অস্ত্রাল জাতির লক্ষণ) দেখতে পাব। নীচে আমরা বিভিন্ন জাতির শির ও নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা সমূহের পরিসীমা দেখালাম—

জাতি	শির-সূচক সংখ্যা	নাসিকা-সূচক সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
ব্রাহ্মণ	৭২-৮৭	৫০-১০০	১৫৫০-১৭৩৪
কায়স্থ	৭০-৮৮	৫৬-৮২	১৪৬৬-১৮১০
সদ্গোপ	৭২-৮৭	৫৫-৯৮	১৫১০-১৭৮০
কৈবর্ত	৭০-৮৭	৬৩-১০১	১৫৯০-১৭৭৬
পোদ	৭০-৮৫	৬৩-৯১	১৫৯০-১৮৫০
চণ্ডাল	৭০-৮৯	৬২-৮৯	১৪৭২-১৭২৪
বাগ্দী	৬৮-৮৩	৬২-১১০	১৬২৪-১৭২২
ভূমিজ	৬৭-৮৫	৭২-১১৩	১৪৬০-১৭৮২
সাঁওতাল	৬৯-৮৮	৬৬-১১১	১৫১০-১৭৭০
মুণ্ডা	৬৯-৮১	৭৬-১১১	১৪৪৬-১৭১৮
ওরাঁও	৬৭-৮৭	৭০-১১৩	১৪৮০-১৭৪৪

যাক, আমরা এবার গড়ের দিকে একটু বিচার করি। কায়স্থদের শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ও নাসিকাকার জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা প্রায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমান। কিন্তু কায়স্থদের দেহ-দৈর্ঘ্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম। সদ্গোপদেরও শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সঙ্গে প্রায় সমান, কিন্তু তাদের নাক কিছু বেশী প্রসারিত ও দেহ-দৈর্ঘ্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক কম। গোয়ালা, কৈবর্ত ও পোদেদের বিস্তৃত-শিরস্কতা অনেক কম, কিন্তু নাক বেশী প্রসারিত, এবং দেহ-দৈর্ঘ্য গোয়ালাদের অপেক্ষা কৈবর্তদের কম, ও তাদের চেয়েও কম পোদেদের। যদিও রাজবংশীদের নাক কৈবর্তদের সঙ্গে সমানভাবে প্রসারিত, তথাপি তারা নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক ও কৈবর্তদের চেয়ে দেহ-দৈর্ঘ্যে অনেক খাটো। তবে রাজবংশীদের সঙ্গে যে মঙ্গোলীয় পর্যায়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা আমরা পরে আলোচনা করব। বাগ্দী ও বাউরীরা নাতিদীর্ঘ-শিরস্ক, বিস্তৃত নাসা ও দৈহিক উচ্চতায় অনেক কম। সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে যে, বাগদী ও বাউরীদের উপর আদি-অস্ত্রাল প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে রয়েছে। পোদেদের সঙ্গে বাঙলার মুসলমানদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ নেই।

আরও বলা দরকার, বাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ

বিশেষ কিছু নেই। নীচের তালিকায় প্রদত্ত পরিমাপ দেখলে এটা বুঝতে পারা যাবে।

ব্রাহ্মণ শ্রেণী	শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
রাঢ়ী	৭৯·৫	৬৫·৮	১৬৬১
বারেন্দ্র	৮০·১	৬৫·৩	১৬৫৮
পাশ্চাত্য বৈদিক	৭৮·৯	৬৪·১	১৬৫৮
দাক্ষিণাত্য	৭৯·৯	৬৭·৫	১৬৭৫

বাঙলার বৈদ্যদের পরিমাপও অনেকটা এরূপ।

অঞ্চল-ওয়ারী সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে রাঢ়, সমতট, ও বঙ্গের উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে গোল মাথা ও লম্বা দেহ, অন্যান্য জাতি ও মুসলমানদের চেয়ে বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে যে আলপীয় উপাদান সবচেয়ে বেশী, তা এ থেকেই প্রমাণ হয়।

তবে সংমিশ্রণ যে সব জাতেরই মধ্যে ঘটেছে, এবং এক জাতির মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা নীচে প্রদত্ত রাজবংশীদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ থেকে বুঝতে পারা যায়।

	শিরাকার-জ্ঞাপক সূচকসংখ্যা	নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচকসংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
ক. ক্ষত্রিয় রাজবংশী (জলপাইগুড়ি)	৭৬·২	৭২·৮	১৬০৮
খ. দেশী রাজবংশী (পঃ দিনাজপুর)	৭০·৩	৭১·৫	১৬০০
গ. পলিয় রাজবংশী (মালদহ)	৭৬·৮	৭৪·০	১৫৯২
ঘ. রাজবংশী (মুর্শিদাবাদ)	৭৭·৭	৭৪·০	১৬১০
ঙ. রাজবংশী (চব্বিশ পরগণা)	৭৫·৪	৭৬·৯	১৬০৭

তবে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-মূলক মঙ্গোলীয় চোখের খাঁজ (epicanthic fold) লক্ষিত হয়। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরে দেশী রাজবংশীদের মধ্যে উহার অভাব দেখা যায়। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, আর দেশী রাজবংশীদের সঙ্গে ঘটেছে দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ।

তবে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সামান্য হেরফের থাকলেও আমরা কয়েকটি বিশেষ জাতির মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক ঐক্য লক্ষ্য করি। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সদ্গোপরা একই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। অনুরূপভাবে গোয়ালা, কৈবর্ত ও পোদেরা একই শ্রেণীভুক্ত। চণ্ডালরা কেবল ব্যতিক্রম। আর সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিসমূহ একই পর্যায়ভুক্ত।

আমরা উপরে যে আলোচনা করেছি, তা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হচ্ছে—

১. বাঙলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্গোপ প্রভৃতি উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে আলপীয় উপাদানই প্রধান। তবে মিশ্রণও যথেষ্ট ঘটেছে। কুলজী গ্রন্থসমূহ অনুসারে বাঙলার রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যে দাবী করেন, তাঁরা আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ থেকে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর, তার পিছনে কোনরূপ নৃতাত্ত্বিক সমর্থন নেই। উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণরা দীর্ঘ-শিরস্ক। বাঙালী ব্রাহ্মণরা বাঙলার অন্যান্য জাতির ন্যায় বিস্তৃত-শিরস্ক।

২. অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে আলপীয় উপাদান আপেক্ষিক ভাবে কম।

৩. তফসীলভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে দেশজ উপাদানই (আদি-অস্ট্রাল ও দ্রাবিড়) বেশী।

৪. উপজাতিসমূহ দুই পর্যায়ে বিভক্ত—

   ক. সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদি-অস্ট্রাল।

   খ. উত্তরপূর্ব সীমান্তের উপজাতিসমূহ, যথা; লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙলার জাতিসমূহের আদি নিবাসস্থল

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি আমরা বাঙলার জাতিসমূহের আদি আবাসস্থান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করি। প্রথমেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে বাঙলায় কোন দিন চাতুর্বর্ণ্য প্রথার প্রাদুর্ভাব ছিল না। বাঙলা ছিল কৌম-সমাজের দেশ। এই সমাজের মধ্যে ছিল বিভিন্ন বৃত্তিধারী গোষ্ঠী। সুতরাং বাঙলায় উত্তর ভারতের গোঁড়া হিন্দুসমাজের মত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল না। এই সম্পর্কে আরও মনে রাখতে হবে যে বাঙলা ছিল তন্ত্রধর্মের লীলাক্ষেত্র। পরে যখন বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন বৌদ্ধরাও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করে। এই সকল ধর্মে জাতিভেদ ছিল না।

বাঙলায় যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন ব্রাহ্মণদের এই সামাজিক পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তার মানে বাঙলায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ মাত্র এই বিভেদ ছিল। পাল যুগের পরে যখন সেন রাজাদের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই দ্বিতীয় সেনরাজা বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) একটা জাতি-বিন্যাস করবার চেষ্টা করেন। সেই জাতিবিন্যাসের চিত্র আমরা বৃহদ্ধর্মপুরাণে পাই। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার বাকী জাতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—১. উত্তম সঙ্কর, ২. মধ্যম সঙ্কর, ও ৩. অন্ত্যজ। সেই সকল জাতির মধ্যে অনেককেই আজ আমরা বাঙলায় দেখতে পাই। (লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' দেখুন)। পরে আরও একটা শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছিল। সেটা হচ্ছে, ব্রাহ্মণরা কোন্ জাতির হাতের জল গ্রহণ করবেন। এর জন্য নয়টি জাতি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেজন্য তাদের বলা হয় নবশাখ। এই নয়টি জাতি হচ্ছে তিলি, তাঁতী, মালাকার, সদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক ও ময়রা। বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম সঙ্করের অন্তর্ভুক্ত ছিল করণ ও অম্বষ্ঠ। এরাই পরবর্তী কালে কায়স্থ ও বৈদ্য নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাঙলার অধিকাংশ জাতিরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের আঞ্চলিক প্রাধান্য। আঞ্চলিক প্রাধান্য থেকে আমরা তাদের আদি আবাসস্থল সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করতে পারি। তবে আজ পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা, তাদের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত করেছে। সেজন্য, মনে হয়, আজকের পরিবর্তে একশ বছর আগেকার পরিস্থিতিটা আমাদের অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। সেজন্য আমরা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদম শুমারীর সাহায্য নিচ্ছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মাত্র আটটি জেলার পরিস্থিতি আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি। এই আটটি জেলা যথাক্রমে—

জেলা	আয়তন বর্গমাইল	মোট জনসংখ্যা
১. মেদিনীপুর	৫,০৮২	২৫,৭০,৯৬৩
২. হুগলী-হাওড়া	১,৮৭২	১৪,৮৮,৫৫৬
৩. বর্ধমান	৩,৫২৩	২০,৩৪,৭৪৫
৪. বাঁকুড়া	১,৩৪৬	৫,২৬,৭৭২
৫. বীরভূম	১,৩৪৪	৬,৯৬,৯৪৩
৬. চব্বিশ পরগণা	২,৫৩৬	২২,১০,০৪৭
৭. নদীয়া	৩,৪১৪	১৮,১২,৭৯৫

এই আটটি জেলায় যে সকল জাতি বাস করত, সংখ্যা পরিমাণ দিক থেকে তাদের স্থান নীচে দেখান হচ্ছে—

জাতি	সংখ্যা	জাতি	সংখ্যা
১. কৈবর্ত	১৩,৫৮,৫৩১	৮. পোদ	২,৭০,৯৩৩
২. বাগ্দী	৬,৪৭,১০৮	৯. তাঁতী	২,৫৪,৩৭৩
৩. ব্রাহ্মণ	৬,১৬,৬৫৯	১০. চামার	২,১৮,৩৪০
৪. সদ্গোপ	৬,১৬,৫৩৬	১১. বাউরী	১,৮৯,১০৬
৫. গোয়ালা	৪,৪৪,৬৯৯	১২. কেওরা	২,৪৭,৪২৯
৬. কায়স্থ	৩,৩৬,৩০০	১৩. চণ্ডাল	১,৪৩,০১২
৭. তিলি	২,৯৩,২১২	১৪. নাপিত	১,২২,৮৪৩

	জাতি	সংখ্যা		জাতি	সংখ্যা
১৫.	ডোম	১,৩৩,২৫৪	২৩.	ময়রা	৬১,৬৩১৪
১৬.	যুগী	১,২১,৭৯৬	২৪.	তাম্বুলী	৫৪,৯৪৪
১৭.	কুম্ভকার	১,১২,৪৩৬	২৫.	বারুই	৩৪,৩৬১
১৮.	হাড়ি	১,০১,৩১৫	২৬.	বৈদ্য	২১,১৪৮
১৯.	শুঁড়ি	৯৩,৪৭০	২৭.	ভুঁইয়া	১৫,১৭৮
২০.	গন্ধবণিক	৭৯,১০১	২৮.	কাঁসারী	১৪,৯৭৭
২১.	সুবর্ণবণিক	৭৪,৪৬৩	২৯.	মেথর	১৪,৭৬৪
২২.	আগুরী	৬৯,০৯১	৩০.	শাখারী	৬,৩৯০

১. কৈবর্তদের ৬,৯২,১৪০ জন বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, ও ২,৮৮,৬২১ জন হুগলী-হাওড়া জেলায়। তার মানে কৈবর্তদের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ সংযুক্ত এই জেলাসমূহে বাস করত। সেজন্য এটাই মনে হয় তাদের আদি আবাস স্থল। এরা অতি প্রাচীন জাতি। বর্তমানে চাষী কৈবর্তরা, তার মানে উচ্চশ্রেণীর কৈবর্তরা 'মাহিষ্য' নামে পরিচিত। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদম শুমারীর সময় এরা কেউই নিজেকে 'মাহিষ্য' বলে দাবী করে নি।

২. বাগদীদের ২,০৫,০৭৪ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১,৫২,৬১৮ জন হুগলী-হাওড়া জেলায় ও ৯৯,৮২৬ জন ২৪ পরগণায়। তার মানে বাগদীদের মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ এই অঞ্চলসমূহে বাস করত। মনে হয় বর্ধমান ও হুগলী-হাওড়া এই সংযুক্ত অঞ্চলই তাদের আদি আবাসস্থান ছিল। এবং পরে তারা ভাগীরথী অতিক্রম করে, ২৪ পরগণায় প্রবেশ করেছিল। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে প্রাচীন গ্রীস দেশীয় লেখকদের রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি যে মৌর্যদের সময় পর্যন্ত বাগদীরাই রাঢ়দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল।

৩. ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বেশী বাস করত বর্ধমান জেলায়। এবং তার পর যথাক্রমে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হুগলী-হাওড়া জেলায়। ব্রাহ্মণরা সাধারণতঃ যজন-যাজন করতেন ও তাঁরা যজমানদের অনুসরণ করতেন। সে জন্য তাঁদের আদি বাসস্থান নির্ণয় করা কঠিন।

৪. সদেগাপদের ১,৮৫,৮০৪ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১,৮৩,০৮০ জন মেদিনীপুর জেলায়, ১০৭,৬৩০ জন বীরভূম জেলায় ও ৬৩,৭৭৪ জন হুগলী-

হাওড়া জেলায়। তার মানে, তাদের মোট সংখ্যার ৮৭ শতাংশ এই সংযুক্ত অঞ্চলে বাস করত। তাদের আদি বাসস্থান ছিল গোপভূমে বা বর্ধমান-বীরভূম জেলায়। সেখান থেকেই তারা অন্যত্র গমন করেছে।

৫. গোয়ালাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় যথাক্রমে বর্ধমান, ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায়। এই তিন জেলায় তাদের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ বাস করত।

৬. কায়স্থদের ১০১,৬৬৩ জন বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, ৮২,৮০১ জন ২৪ পরগণায় ও ৫৩,৩৯৮ জন বর্ধমান জেলায়। তার মানে, তাদের মোট জন-সংখ্যার ৭০ শতাংশ এই তিন জেলায় বাস করত। সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে মনে হয়, তারা প্রথমে বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, এবং সেখান থেকে তারা নিজেদের অন্যত্র বিস্তার করেছিল।

৭. তিলিদের ৯৩,২০৩ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১০,৩৩৯ জন মেদিনীপুর জেলায় ও ৪১,৩২২ জন বীরভূমে। তার মানে, এই তিন জেলায় বাস করত ৬৯ শতাংশ। তাদের আদি বাসস্থান বর্ধমান জেলায় ছিল বলেই মনে হয়।

৮. পোদেরা মুখ্যতঃ ২৪ পরগণার লোক, কেন না এই জেলাতেই তাদের ৯২ শতাংশ বাস করত।

৯. তাঁতীরা মুখ্যতঃ মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া ও বর্ধমান, এই সংযুক্ত অঞ্চলের লোক। এখানেই বাস করত তাদের ৭৫ শতাংশ লোক।

১০. বাউরীরা বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার লোক। কেননা এই দুই জেলায় বাস করত তাদের ৭৮ শতাংশ।

১১. চামাররা ২৪ পরগণা, নদীয়া ও বর্ধমান জেলার লোক। এই তিন জেলায় তাদের ৮৩ শতাংশ বাস করত।

১২. ডোমেরা বর্ধমান ও বীরভূম, এই সংযুক্ত অঞ্চলের লোক। এই দুই জেলায় তাদের ৬৫ শতাংশ বাস করত।

১৩. কেওরাদের আদি বাসস্থান ২৪ পরগণা ও হুগলী-হাওড়া জেলাসমূহের কোন একটিতে ছিল বলে মনে হয়। এই জেলাসমূহে তাদের ৫৫ শতাংশ বাস করত।

১৪. যুগীরা, পোদদের মত ২৪ পরগণার লোক। কেননা এই জেলাতেই তাদের ৬৮ শতাংশ বাস করত।

সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে অন্যান্য কয়েকটি জাতির আবাসস্থল নীচে দেখান হচ্ছে—

১৫। কুম্ভকার—মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া, বর্ধমান ও নদীয়া (৭৭শতাংশ)।

১৬. হাড়ি—বর্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা। (৮৭ শতাংশ)

১৭. শুঁড়ি—বর্ধমান, বীরভূম (৪৬ শতাংশ)। বাকী লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অন্যান্য জেলা সমূহে ছড়িয়ে ছিল।

১৮. গন্ধবণিক—বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর (৬৬ শতাংশ)

১৯. সুবর্ণবণিক—২৪ পরগণা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর (৬৬ শতাংশ)

২০. আগুরী—বর্ধমান (৮৫ শতাংশ।

২১. ময়রা—বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া (৫৯ শতাংশ)।

২২. তাম্বুলী—বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া (৮০ শতাংশ)

২৩. বারুই—বর্ধমান, হুগলী-হাওড়া, ২৪ পরগণা (৭৫ শতাংশ)।

২৪. বৈদ্য—সব জেলাতেই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল, তবে বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় বেশী।

২৫. নাপিত—মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা (৬৪ শতাংশ)।

২৬. ভূঁইয়া—মেদিনীপুর।

২৭. কাঁসারী—২৪ পরগণা, হুগলী-হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া।

২৮. মেথর—২৪ পরগণা, মেদিনীপুর।

২৯. শাঁখারী—মেদিনীপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগণা।

৩০. চণ্ডাল—২৪ পরগণা, বর্ধমান ও নদীয়া। বর্তমানে এরা নমশূদ্র নামে পরিচিত।

এখন দেখা যাক, জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই আটটি জেলার বিভিন্ন জাতির স্থান কি। প্রতি জেলায় প্রথম পাঁচটি জাতির স্থান নীচের ছকে দেখান হচ্ছে—

স্থান	মে	হু	ব	বাঁ	বী	প	ন
প্রথম	১	১	৫	৯	২	১২	১
দ্বিতীয়	২	৫	২	৩	৫	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	[illegible]	৩	৩	৩
চতুর্থ	৪	৬	৬	৬	৮	৫	১১
পঞ্চম	৫	২	৭	১১	৯	৬	১০

টীকা—জেলা : মে = মেদিনীপুর, হু = হুগলী-হাওড়া; ব = বর্ধমান; বাঁ = বাঁকুড়া, বী = বীরভূম, প = ২৪ পরগণা, ন = নদীয়া।

জাতি : ১ = কৈবর্ত; ২ = সদ্গোপ; ৩ = ব্রাহ্মণ; ৪ = তাঁতী; ৫ = বাগ্দী, ৬ = গোয়ালা; ৭ = তিলি, ৮ = ডোম; ৯ = বাউরী; ১০ = চণ্ডাল, ১১ = চামার।

উপরের ছক থেকে প্রকাশ পায় যে, অন্যান্য জাতির জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কৈবর্তদের প্রথম স্থান হচ্ছে মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া ও নদীয়া জেলায়। ২৪ পরগণায় তারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। সদ্গোপরা প্রথম স্থান অধিকার করে বীরভূম জেলায়, ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। হুগলী-হাওড়ায় তাদের স্থান পঞ্চম। বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। ব্রাহ্মণরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে সব জেলাতেই, কেবল বাঁকুড়ায় তাদের স্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। বাগ্দীরা প্রথম স্থান অধিকার করে বর্ধমান জেলায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান হুগলী-হাওড়া ও বীরভূমে। ২৪ পরগণায় তাদের স্থান হচ্ছে চতুর্থ ও মেদিনীপুরে পঞ্চম। বাঁকুড়া ও নদীয়ায় প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। গোয়ালারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নদীয়ায়, চতুর্থ স্থান হুগলী-হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় ও পঞ্চম স্থান ২৪ পরগণায়। বীরভূমের প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। পোদেরা প্রথম স্থান অধিকার করে ২৪ পরগণায়। অন্য জেলায় প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের

কোন স্থান নেই। তাঁতীরা চতুর্থ স্থান অধিকার করে মেদিনীপুরে, তিলিরা তৃতীয় স্থান বাঁকুড়ায় ও পঞ্চম স্থান বর্ধমানে; ডোমেরা চতুর্থ স্থান বীরভূমে; চামার ও চণ্ডালরা যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান নদীয়ায়; বাউরীরা প্রথম স্থান অধিকার করে বাঁকুড়ায় ও পঞ্চম স্থান বীরভূমে। প্রথম পাঁচের মধ্যে অন্যান্য জেলায় এদের আর কোন স্থান নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা বাঙলার উপজাতি ও হিন্দু জাতিসমূহ সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু বলি নি। এবার আমরা মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু বলব।

বাঙলার মুসলমানদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—

১. আগন্তুক মুসলমান।
২. ধর্মান্তরিত মুসলমান, ও
৩. উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুসলমান।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাঙলার মুসলমান শাসকগণ ও পাঠান সুলতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আনীত বিদেশী মুসলমানগণের বংশধরগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যারা স্বেচ্ছায় বা যাদের বল-পূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধরগণ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী।

বাঙলায় মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পর। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী প্রথম বাঙলা জয় করেন। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক দেওয়ানী গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই সার্ধ পাঁচশত বৎসর বাঙলা মুসলমানগণের অধীনে থাকে। আগন্তুক মুসলমানই বলুন, আর ধর্মান্তরিত মুসলমানই বলুন, আর এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানই বলুন, তাদের সকলেরই উদ্ভব হয়েছিল এই সার্ধ পাঁচশ বছরের মধ্যে। তবে এর পর যে কেহ মুসলমান হয় নি, এমন কথাও সত্য নয়। এর পরও হিন্দু মুসলমান হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সেরূপ মুসলমানেরা সকলেই দেশজ মুসলমান।

দুই

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত আদম শুমারীর সময় মুসলমানরা দাবী করেছিল যে তারা দেশজ সম্প্রদায় নয়, তারা সকলেই বাঙলায় আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর। তার মানে তারা সকলেই সৈয়দ, মুঘল ও আফগান শাসকমণ্ডলীর বংশধর। সে দাবীটা যে সম্পূর্ণ অমূলক ও অলীক, তা তৎকালীন আদম শুমারীর কমিশনার ই. এ. গেট (E. A. Gait) প্রমাণ করেন। তিনি বলেন যে, যে সকল রাজকীয় মুসলমান কর্মচারীদের এদেশে আনা হয়েছিল তারা তৎকালীন রাজধানীসমূহ যথা গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরের নিকট এসে বসবাস করেছিল। তারা তৎকালীন সুলতান ও নবাবদের কাছ থেকে বসবাসের জন্য ভূমিদানও পেয়েছিল। সেই সকল ভূমিদানসংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই সকল ভূমিদান তারা গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মুর্শিদাবাদের নিকটেই পেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমান জনসংখ্যার বিন্যাস দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, যে যদিও এরূপ ভূমিদানসংক্রান্ত দলিলাদি উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে খুবই কম, তথাপি বাঙলার এই দুই অংশেই মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে মুসলমানদের যে জনবিন্যাস ছিল, সেই সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকেও, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। যথা—

অঞ্চল	মুসলমান জনসংখ্যা	প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	১,০৪,৭২০	১,৩১৭
মধ্যবঙ্গ	৩,৭৭৩,৫২১	৪,৮৭৫
উত্তরবঙ্গ	৫,৮৭৬,৪০৮	৫,৮৭৩
পূর্ববঙ্গ	১১,২২০,৪২৭	৬,৬১৭

উত্তর বঙ্গের পরিস্থিতিটা বুকানন হ্যামিলটনও (Buchanan Hamilton) লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা যে বাঙলায় আগন্তুক মুসলমানগণের বংশধর, এরূপ বিবেচনা করবার সপক্ষে বিশেষ কিছু প্রমাণ নেই। তিনি বলেছিলেন যে, তারা ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমান

ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তী কালে একজন মুসলমান লেখকও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে, উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা মঙ্গোলীয় কোচ জাতির দৈহিক লক্ষণ সমূহ বহন করে।' তার মানে, তারা ধর্মান্তরিত কোচ (বর্তমানে রাজবংশী) জাতি হতে উদ্ভূত। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও যে ধর্মান্তরিত দেশজ হিন্দুজাতি-সমূহ হতে উদ্ভূত, তা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ওয়াইজ-ও (Dr. Wise) বলেছিলেন।

বস্তুতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে কিছুকালের জন্য মুসলমান সুলতানরা পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ হতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা পীর, দরবেশ ও মোল্লা নিযুক্ত করে পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পাইকারী হারে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান জালালুদ্দিনের সময় (১৪১৪-১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে) এই ধর্মান্তরিত করার অভিযান তুঙ্গে উঠেছিল। দুরকম নিম্নসম্প্রদায় হিন্দুদের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল—'নয় কোরাণ গ্রহণ কর, আর তা নয়ত মৃত্যু বরণ কর।' প্রাণভয়ে অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। যারা অস্বীকৃত হয়েছিল, তারা কামরূপ, আসাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ধর্মান্তরিতকরণ সম্বন্ধে বার্নিয়ার (Bernier) তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এক কাহিনী উল্লেখ করে গেছেন। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিশানা ছিল, ঘরের চালের উপর একটা 'বদনা' বসিয়ে রাখা। একবার এক মৌলবী কিছুদিনের জন্য দেশান্তরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এক ধর্মান্তরিত মুসলমানের ঘরের চালে আর 'বদনা' দেখতে পান না। অনুসন্ধানে জানলেন যে, লোকটা আবার হিন্দু হয়ে গিয়ে হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ জাতিভুক্ত হয়েছে। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি নবাবের নিকট ফৌজ পাঠাবার আবেদন জানান। নবাব একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ওই সৈন্যদলের সাহায্যে মৌলবী সমগ্র গ্রামের লোকেদের মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

বাঙলার মুসলমানগণ যে আগন্তুক মুসলমান নন্, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মুসলমান ইতিহাসকারগণ কেউই লিখে যান নি যে, কোন কালে উত্তরভারত থেকে দলবদ্ধভাবে মুসলমানরা এসে বাঙলা দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। বরং আমরা জানতে পারি যে, বাঙলা দেশে যে সকল পাঠান ও আফগান মুসলমান ছিল, তারা সম্রাট আকবর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ওড়িষায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

মুঘল যুগেও পূর্ববাঙলাকে অস্বাস্থ্যকর জায়গা বলে মনে করা হত, এবং যে সকল রাজকীয় কর্মচারী এখানে আসতেন, তাঁরা দুপয়সা কামাবার পর, আবার দিল্লী কিংবা আগ্রায় ফিরে যেতেন। একমাত্র যেখানে কিছু সংখ্যক বিদেশী মুসলমান ছিল, সে জায়গাটা হচ্ছে চট্টগ্রাম। বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদেশীয় যে সকল মুসলমান বণিক চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা হচ্ছে তাদের বংশধর।

তিন

জোর জুলুম করেই যে মুসলমান করা হত, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্নসম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ এদের হেয় চক্ষে দেখতেন। এ সকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' দ্বারাও আকৃষ্ট হত। খানকাগুলি ছিল মসজিদ ও দরগার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া দাওয়া দুই পাওয়া যেত। এ ছাড়া ছিল পদস্খলিতা হিন্দু সধবা ও বিধবা। হিন্দু সমাজে এদের কোন স্থান ছিল না। যদি হিন্দু রমণী মুসলমানের সহিত ভ্রষ্ট হত, তা হলে সে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে, তার মুসলমান উপপতির পরিবারে বিবির স্থান পেত। এ ছাড়া ছিল, দেশে দাসদাসীর ব্যবসা। অসময়ে দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে মেয়ে বেচে দিত। যখন মুসলমানরা তাদের কিনত, তখন তারা তাদের ধর্মান্তরিত করত।

উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুরা খুব কমই ধর্মান্তরিত হত। তবে যাদের যখন যবন দোষ ঘটত (নিষ্ঠাবান সমাজের পাতি অনুযায়ী মুসলমানের খাদ্য আঘ্রাণ করলেও যবন দোষ ঘটত), নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ তাদের একঘরে করত। তাদের মধ্যে অনেকেই মর্যাদা পাবার জন্য মুসলমান হয়ে যেত। এ ছাড়া, মুর্শিদ কুলী খানের আমলে কোন জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন, তা হলে তাঁকে সপরিবারে মুসলমান করা হত।

বাঙলার মুসলমানরা যে হিন্দুসমাজ থেকেই ধর্মান্তরিত, তা তাদের আচার-ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায়। এ সকল আচার-ব্যবহার বর্তমান শতাব্দীর

গোড়া পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। প্রথমত, তারা ধর্মান্তরিত হবার পূর্বে হিন্দু সমাজে যে সকল কৌলিক বৃত্তি বা পেশা অনুসরণ করত, মুসলমান হবার পরেও তাই করত। দ্বিতীয়, এদের ভাষা ও সাহিত্য থেকেও তাই প্রকাশ পায়। তৃতীয়, তাদের নামকরণ থেকেও তাই বুঝতে পারা যায়। যেমন কালি শেখ, কালাচাঁদ শেখ, ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, হারু শেখ ইত্যাদি। চতুর্থ, ধর্মান্তরিত হবার পরেও তারা হিন্দুর অনেক সংস্কার, ও লৌকিক পূজাদি অনুসরণ করত। যেমন দুর্গাপূজার সময় তারা হিন্দুদের মত নূতন কাপড় জামা পরে পূজা বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করতে যেত। ছেলে মেয়ের বিবাহের সময়ও তারা হিন্দু জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করত। দৈনন্দিন জীবনেও তারা হিন্দুর বিধি-নিষেধ মানত ও হিন্দুর পঞ্জিকা অনুসরণ করত। এ ছাড়া, মহামারীর সময় শীতলা, রক্ষাকালী প্রভৃতির পূজা করত, ও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে ষষ্ঠী পূজা করত। এমন কি, অনেক জায়গায় বিবাহের পর মেয়েরা সীমন্তে সিঁদুরও পরত। এ সকল আচার-ব্যবহার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও মোল্লাদের প্ররোচনায় ক্রমশ বর্জিত হয়েছে।

চার

মোট কথা, বাঙালী মুসলমান মূলত বাঙলাদেশেরই সন্তান। আজ যে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নিজেদের দেশকে 'বাংলাদেশ' বলে অভিহিত করে ও নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, তার পিছনে যথেষ্ট ঐতিহাসিক সত্য আছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের দিক দিয়েও, এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হয়। রীজলি যে পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিরাকার সূচক-সংখ্যা ঠিক ওই অঞ্চলের নমশূদ্রদের শিরাকার-সূচক সংখ্যার সহিত একেবারে অভিন্ন। এই সকল মুসলমানদের নাসিকাকার-সূচক-সংখ্যা নমশূদ্রদের চেয়ে বেশী, কিন্তু পোদেদের চেয়ে বেশী তফাৎ নয়। নীচে এই তিন গোষ্ঠির সূচক-সংখ্যা দেওয়া হল—

জাতি	শিরাকার-সূচক-সংখ্যা	নাসিকা-সূচক-সংখ্যা
মুসলমান	৭৭·৯	৭৭.৫
নমশূদ্র	৭৮-১	৭৪.২
পোদ	৭৭-৮	৭৬.৪

পূর্ববঙ্গ ছাড়াও, বাঙলার অন্য অঞ্চল হতে যে পরিমাপ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে—

অঞ্চল	শিরাকার-সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ-মিঃ মিঃ
রাঢ়	৭৮-৬	১৬৬০
বরেন্দ্র	৭৮-৮	১৬৬৪
বঙ্গ	৭৯-৯	১৬৫১
চট্টল	৭৯-৭	১৬৪
সমতট	৮০-৩	১৬৪৮
কলিকাতা	৮০-০	১৬৬০
সমষ্টিগত গড়	৭৯-৭	১৬৫৪

এই সকল সূচক-সংখ্যা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালী মুসলমান বাঙলার অন্যান্য জাতির ন্যায় বিস্তৃত-শিরস্ক জাতি। উত্তর ভারতের দীর্ঘশিরস্ক জাতিসমূহের সহিত তাদের সংমিশ্রণ খুব কমই ঘটেছে। এক কথায়, বাঙালী মুসলমান বাঙালী, তারা আগন্তুক নয়।

পরিশিষ্ট ক

বাঙলার তফশীলভুক্ত জাতিসমূহ

১. বাউরী
২. চামার
৩. ধোবা
৪. ডোম
৫. দোসাধ
৬. ঘাসি
৭. লালবেগী
৮. মুসাহার
৯. পান
১০. পালি
১১. রাজওয়ার
১২. তুরি
১৩. বাগদী
১৪. বাহেলিয়া
১৫. বাইতি
১৬. বেদিয়া
১৭. বেলদার
১৮. ভুঁইমালী
১৯. ভুইয়া
২০. বিন্দ
২১. দামাই
২২. দোয়াই
২৩. গোঁড়ি
২৪. হাড়ি
২৫. জেলে কৈবর্ত
২৬. ঝালোমালো
২৭. কাদার
২৮. কামি
২৯. কানদ্রা
৩০. কেওরা
৩১. করেংগা
৩২. কাউর
৩৩. কেওট
৩৪. খটিক
৩৫. কোচ
৩৬. কোনাই
৩৭. কোঁয়ার
৩৮. কোটাল
৩৯. লোহরে
৪০. মাহার
৪১. মাল
৪২. মাল্লা
৪৩. মেথর
৪৪. নমশূদ্র
৪৫. নুনিয়া
৪৬. পলিয়া
৪৭. পাটনি
৪৮. পোদ্দ
৪৯. রাজবংশী
৫০. সরকি
৫১. শুঁড়ি
৫২. তিয়র
৫৩. বানটার
৫৪. চৌপল
৫৫. ভোগতা
৫৬. দাবগর
৫৭. হালালখোর
৫৮. কানজর
৫৯. কুরারিয়ার
৬০. নট
৬১. ভূমিজ
৬২. ভঙ্গী
৬৩. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়

পরিশিষ্ট খ

বাঙলার অন্যান্য প্রধান জাতিসমূহ

১. ব্রাহ্মণ
২. বৈদ্য
৩. কায়স্থ
৪. সদ্গোপ
৫. তিলি
৬. মালাকার
৭. তাঁতী
৮. নাপিত
৯. বারুই
১০. কামার
১১. কুম্ভকার
১২. গন্ধবণিক
১৩. ময়রা
১৪. সুবর্ণবণিক
১৫. আগুরী
১৬. অঘোরী
১৭. চাষাধোবা
১৮. গোয়ালা
১৯. কৈবর্ত
২০. মাহিষ্য
২১. অগ্রদানী ব্রাহ্মণ
২২. বাগল
২৩. যুগী
২৪. কাঁসারী
২৫. তাম্বুলী
২৬. স্বর্ণকার
২৭. সূত্রধর
২৮. শাহাবণিক
২৯. শাঁখারী
৩০. বৈষ্ণব

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা ৩

স্বদেশ ও স্বজাতির কথা সকলের কাছেই প্রিয়। স্বদেশের ইতিহাস যেমন আমাদের অবশ্যপাঠ্য বিষয়, স্বজাতির পরিচয়ও তেমনি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়।

'বাংলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থের স্বল্প পরিসরের মধ্যে বাঙালী জাতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা স্বচ্ছ সাবলীল সহজবোধ্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত এই গ্রন্থের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে, বলা যেতে পারে। বাঙালী জাতি সম্পর্কে রীতিমত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয় রিজলির সময় থেকে, পরবর্তী কালে ড. বিরজাশঙ্কর গুহ, রমাপ্রসাদ চন্দ, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়ের উপর প্রভূত আলোকপাত করেছেন। ড. অতুল সুর পূর্বসূরীদের আলোচনাসূত্র সযত্নে গ্রথিত করে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান গ্রন্থখানি সুলিখিত, সুসম্বদ্ধ, উপযুক্ত তথ্যসম্বলিত।

মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা